



মাসিক

# আলোকধারা

তাসাওটক বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং-২৭২

২৫তম বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

জুলাই ২০১৯ ঈসামী



২৮ মে'১৯ 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' ব্যবস্থাপনায় বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সমানে মতবিনিময়, ইফতার ও দোয়া মাহফিল-এ আগত অতিথিবৃন্দ।



১৭ জুলাই'১৯ চট্টগ্রামে জার্মান ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র 'ডী স্প্রাক্ষে'র ১২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'আধ্যাত্মিক সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানে 'আধ্যাত্মিক সাহিত্যে চট্টগ্রাম : প্রেক্ষিত মাইজভাগুরী সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা করছেন বিশিষ্ট মাইজভাগুরী গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর।



SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন 'মাইজভাগুরী মরমী গোষ্ঠী'র ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাওয়াল শিল্পীদের সমানে আয়োজিত 'ইফতার মাহফিল-২০১৯'।



২৫ জুন ২০১৯ SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন: 'আলোর পথে' আয়োজিত মাসিক মাহফিলে "পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে সুফিবাদের ভূমিকা" বিষয়ে আলোচনা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জামে মসজিদের সম্মানিত খতীব আজ্জামা হাফেজ ড. মুহাম্মদ নূর হোসাইন।



১৮ এপ্রিল ২০১৯ SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন: 'দি মেসেজ'-এর ব্যবস্থাপনায় নগরীর 'রীমা কনভেনশন সেন্টার' এ আয়োজিত সমাজের সুবিধাবণ্ণিত মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সেবা প্রদান অনুষ্ঠান।

# মাসিক আলোকধারা

THE ALOKDHARA  
A MONTHLY JOURNAL OF  
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৫তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

জুলাই ২০১৯ ঈসায়ী

শাওয়াল-ফিলকুন্দ ১৪৪০ হিজরী

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা

## প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও তৃরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-

মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের

সাজাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

## সম্পাদক

ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

## যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৭১৬ ৩৮৫০৫২

মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০

০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা \$=2

## সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড, বিবিরহাট

পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে  
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbhandari.org.bd

E-mail: sufialokdhara@gmail.com

■ সম্পাদকীয়	২
■ বেলায়তে মোত্তাকা	
খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)	
প্রথম পরিচেদ	
সুন্নতে ওজমা	৩
■ উমাহাতুল মুমিনিন হ্যরত খাদিজা (রা.)	
মোঃ গোলাম রসূল	৬
■ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্মভূমির পরিচয়	
অধ্যাপক জহুর উল আলম	১০
■ গ্রন্থ: দ্য সুফি অর্ডারস ইন ইসলাম এবং গবেষক জে. স্পেনসার	
ট্রিমিংহামের একটি মুখ্যবন্ধ	১৪
■ তাওহীদের সূর্য: মাইজভাণ্ডার শরিফ বেলায়তে মোত্তাকার উৎস সন্ধানে	
জাবেদ বিন আলম	১৬
■ নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল	২৩
■ ফীহি মা ফীহি	
মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর (র.) উপদেশ বাণী	৩৩
■ শিশু-কিশোর মাহফিল	
কোরআন হাদিসের গল্প, ছোটদের কোরআন অভিধান	৩৭
আল্লাহতায়ালার বিশ্বাসকর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ‘ফেরেশতা’ একটি	
	৩৯
■ জীবনালেখ্য	
সুফি কাব্যের কালজয়ী কবি নুরশদ্দিন আবদুর রহমান জামি (র.)	
অনুবাদ ও পুনর্ভাষ : ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ	৮১
■ পাঠক পর্যবেক্ষণ : বাংলার সুন্নিয়াত আজ কোন পথে? -----	৮৮
■ অধ্যনদের সাথে দুর্ব্যবহার জালাতের পথে বাধা	
ফিরোজ আহমাদ	
■ ইন্দুল আযহা'র মর্মবাণী উদ্ধারের সময় এখন	
আলোকধারা প্রতিবেদন	৮৭

## সম্পাদকীয়

তাসাওউফের আলো অবলোকন সহজ কাজ নয়। কিন্তু এই আলো যাঁরা দেখতে পেয়েছেন, তাঁদের কাছে মহান শ্রষ্টা আল্লাহতায়ালার প্রেমময় সভার নেকট্য অর্জন সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তার জন্য আরো প্রয়োজন মহান আল্লাহতায়ালার করণা এবং তাঁরই বঙ্গ শেষ নবী সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি মহান আল্লাহর করণার অদ্বিতীয় প্রতীক হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর দিদার অর্জন। এরই আলোকে বিশ্ব আধ্যাত্মিকতার মিলনকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অন্যতম প্রাণপূরুষ শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) মাইজভাণ্ডারী তাঁর মহামূল্যবান ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এটি পাঠ করলে মনে হয়, তিনি বুঝি গ্রন্থটি এখনই লিখেছেন। এর প্রতিটি শব্দে গভীর ভাবব্যঞ্জনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহজ-দরদী দিক নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কোরআন, হাদিস শরিফ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলির তথ্যনির্দেশ, সূত্রনির্দেশ ও উদ্ধৃতি তিনি সমকালিন সময়ে প্রচলিত গবেষণা অভিসন্ধর্তের আধুনিক রীতিতেই করেছেন। নিজের মৌলিক কথা এবং উদ্ভৃতি-প্রামাণ্য সমূহের সুগভীর বিশ্লেষণে হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) মাইজভাণ্ডারীর জ্ঞানময় আধ্যাত্মিকতার সুবিশাল উচ্চতা এবং বড়মাপের লেখক সভার পরিচয় উত্তোলিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির পবিত্রতা এবং মূল সুর বজায় রেখে এর ভাষা সাধুরীতি থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর বা সারানুবাদের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। স্বভাবতঃই শুরু করা হয়েছে ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ ‘সুন্নতে ওজমা’ থেকে। এ প্রচেষ্টায় সদয় অনুমোদন দিয়েছেন গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানসীন পরম শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ)।

মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সহধর্মিনী মা খাদিজা (রা.)-এর পবিত্র জীবনের উপর আলোকধারা’র এই সংখ্যায় লিখেছেন মোঃ গোলাম রসূল। মা খাদিজা (রা.) পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রসূল (দ.)-এর কাছে সর্বপ্রথম ওহি পৌছার প্রতিহাসিক ঘটনার প্রথম শ্রবণকারী ও অনেকগুলো ওহি নাজিলকালিন সময়ে রসূল (দ.)-এর অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। উম্মতকূলের পবিত্র মা এবং রসূল (দ.)-এর সহধর্মিনী খাদিজা (রা.)-এর সমগ্রজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ উম্মাহাতুল মুমিনিন ‘হ্যরত খাদিজা (রা.)’ শীর্ষক লেখাটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর জ্ঞানগত বর্ণনা রয়েছে অধ্যাপক জহুর উল আলমের ধারাবাহিক ‘জন্মভূমির পরিচয়’ রচনাটিতে। মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর জন্মভূমির পরিচয় প্রসঙ্গে এই লেখায় এই মাটির অপরাপর সুফি-অধ্যাত্ম সাধকদের জীবনালেখ্য, জানার পরিধিকে প্রসারিত করে। পাশাপাশি মাইজভাণ্ডার শরিফের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাঠকদের হাদয়ে প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ আলোও প্রজ্ঞালিত করে।

বিশ্ব তাসাওউফ ও অধ্যাত্মদর্শনের আকাশে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা সুপরিচিত ও সমানের সাথে সমাদৃত। অন্যদিকে আল্লামা জালাল

উদ্দিন রুমি (রহ.)-এর দর্শন মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকায় সমাদৃত হয়ে তা সারা পৃথিবীতে কী ভাবে তরঙ্গিত ও সম্পর্কিত-তা জাবেদ বিন আলমের ‘তাওহীদের সূর্য’ লেখায় বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী অধ্যাত্মবাদ, অধ্যাত্মসাধনার তুরিকা বা নিয়মপদ্ধতি এবং বিশ্বে এই সাধনার নানা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার বিকাশের ইতিহাস নিয়ে পাশ্চাত্যের গবেষক-পণ্ডিতরা বিগত উনিশ শতক থেকে অধ্যয়ন-গবেষণা শুরু করেন। বিশ শতকে এসে এ বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রকাশনা মুদ্রিত হয়ে বের হয়। এই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত। বিশ শতকের ষাটের দশকের গবেষণার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে (ঈসায়ী সনে) বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত জে. স্পেনসার ট্রিমিংহাম-এর গ্রন্থ ‘দ্য সুফি অর্ডারস ইন ইসলাম’ একটি অগ্রগণ্য কাজ হিসেবে বিবেচিত। আলোকধারা’র এই সংখ্যায় গ্রন্থটির মুখ্যবক্রের বা ভূমিকার অনুবাদ ও এর স্কুল একটি আলোচনা মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থে উভয় আফ্রিকা, আরব, পারস্য ও আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুফিবাদ ও ইসলামী সংস্কৃতির উপর ব্যাপক গবেষণা এবং পুনঃ অনুসন্ধান রয়েছে।

আজকের আধুনিক সমাজ জীবনে নারী সমাজের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু নারী ও পুরুষের পৃথক গুরুত্ব নিয়ে প্রচলিত সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের দ্বিধা-স্বন্দের অবসান এখনো হয় নি। জনসংখ্যায় প্রায় সমান সমান নারীরা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় অবদান রাখলেও তার নৈতিক স্বীকৃতি এখনো মুদু। ইসলাম ধর্ম সমাজে নারীর সমান-মর্যাদা ও ভূমিকাকে সুরক্ষিত করেছে। এরই তাৎপর্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা নিয়ে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবালের ধারাবাহিক লেখার প্রথম পর্ব ‘নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম’।

কবি, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ মাওলানা জামি বিশ্বসাহিত্যে একজন বহুপঞ্চিত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ইসলামী সুফিবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ তাঁর কবিতা বিশ্বে সমাদৃত। অনুবাদ ও পুনর্ভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এ সংখ্যায় মুদ্রিত হলো।

শিশুদের বিভাগে এবার অন্যান্য বিষয়ের সাথে মহান আল্লাহতায়ালার বিশ্বয়কর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ‘ফেরেশতা’ প্রসঙ্গিত প্রশ্ন এবং উভয় এই রীতিতে উপস্থাপিত হলো। যা সোনালী বন্ধুদের জন্য অজানাকে জানার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও আগ্রহ বাঢ়াবে নিশ্চয়।

এদেশের চলতি মুসলিম সমাজব্যবস্থায় শাস্তি, সম্প্রীতি, জ্ঞান ও সমৃদ্ধির বড় একটি প্রত্যাশা রয়েছে। কিন্তু নানা ধরনের অপচর্ট, সংকীর্ণতা সেই প্রত্যাশাকে প্রায়শঃ ব্যাহত করছে। এ নিয়ে যে কোনো পর্যবেক্ষণ একটি শুভ সূচনা। একুশ শতকের নানামুখী প্রযুক্তি ও সামাজিক চাঞ্চল্যে এদেশের যুবসমাজের একটি বিরাট অংশের সাথে সুন্নি আলেম সমাজের দূরত্বের বিষয়টি দৃশ্যমান বলে নানা অভিমত পাওয়া যায়। এই দূরত্বের মাঝখানে যে দেয়াল তা অপসারণ করা যায় কী না, এই নিয়ে এখন রয়েছে বিরাট প্রশ্ন। সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ও তথ্যের আদান-প্রদানে একটি নিঃস্বার্থ অসংকোচপূর্ণ পরিবেশ মূলতঃ দরকার। এই ভাবনার সাথে সম্পর্কিত ‘বাংলার সুন্নিয়াত আজ কোন পথে?’ এই শিরোনামে একটি পাঠক পর্যবেক্ষণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হলো।

# বেলায়তে মোত্লাকা

## খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### সুন্নতে ওজমা

#### নবুয়ত ও বেলায়তের স্বরূপ:

সমস্ত সৃষ্টির মুক্তির তরণী হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (দ.)-এর প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে দু'টি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হয়েছিল। এই দু'টির একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত। এ দু'টি নেয়ামত তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বন্ধুতে অভিষিক্ত করে, যার ফলশ্রুতিতে তিনি মেরাজ মিলনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র মুক্ত দিদার লাভ করেছিলেন। মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে নবুয়তের সমাপ্তি ঘটে। সৈয়দুল মোরসালিন, খাতামুন নাবিঙ্গন হিসেবে তিনি নবুয়ত শেষ হওয়ার সনদদাতা। বেলায়তি ক্ষমতায় তিনিই প্রথম আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের মুক্ত পথ আবিষ্কার করেন, যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সফল করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। এরই ফলশ্রুতিতে নবী, অলি, জিন, মানব সবাই তাঁর উম্মত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মুহাম্মদ (দ.)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌তায়ালার এই যে নেয়ামত, তাকেই বলা হয় ‘সুন্নতে ওজমা’।

**নবুয়ত :** নবা শব্দ থেকে নবুয়ত শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। যার অর্থ সংবাদ দেয়া বা প্রদান। নবিউন শব্দটি হচ্ছে কর্তৃবাচক ইস্ম, যার অর্থ সংবাদদাতা। কাজেই মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ বিষয়ক মধ্যস্থতায় নবুয়তকে আল্লাহ্ সমীক্ষে শ্রেষ্ঠতর নৈকট্যপূর্ণ মানবতা বলা হয়। নবুয়ত একটি বিশেষ গুণ। মহান আল্লাহ্ যাকে পছন্দ করেন তাঁকেই তা দেন। এটি সাধনা করে অর্জন করা যায় না।

নবী দুই প্রকার হয়ে থাকেন। (এক) মুরসল-যাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গ্রহ এসেছে। (দুই) পায়র মুরসল-যাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গ্রহ আসে নি, কাজেই এ ধরনের নবী হবেন তাঁর আগের নবী'র অনুসারি।

নবুয়ত আবার দুই ধরনের- (এক) নবুয়তে আম্মা: যার অর্থ এ ধরনের নবী সব মানুষের জন্য, বিশ্বমানবতার জন্য এ ধরনের নবীদের পাঠানো হয়। (দুই) নবুয়তে খাস্সা-, অর্থাৎ এ ধরনের নবীরা প্রেরিত হন বিশেষ কোনো কওম বা জাতির

#### জন্য।

**বেলায়ত:** বেলায়ত আরবি ‘অলা’ শব্দ থেকে উৎপন্ন। অলা অর্থ খুব কাছে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া বা নৈকট্য লাভ। এই শব্দটির সাথে অর্থগত দিক দিয়ে প্রেম, ভালবাসা প্রায় সমার্থক, তবে তা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মহান আল্লাহ্‌তায়ালার কাছাকাছি হওয়া বা তাঁর নিকটবর্তী সম্পর্ককে বেলায়ত বলে।

বেলায়ত আবার দুই প্রকার-(এক) বেলায়তে ঈমান এবং (দুই) বেলায়তে ইহসান। বেলায়তে ঈমান বলতে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে সম্পর্ককে বুঝায়। এই বেলায়ত আল্লাহতে বিশ্বাসীগণ বা মোমেনগণ পেয়ে থাকেন। বেলায়তে ইহসান হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং বিশেষ ক্ষমতা। যা শুধুমাত্র নবী ও অলীগণই পেয়ে থাকেন।

নবী করিম (দ.)-এর পবিত্র সত্ত্ব নবুয়ত ও বেলায়ত দু'টোই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলো। তাঁর পর আর কোনো নবী নেই এবং আর কোনো নবী আসার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু অলীগণের জন্য বেলায়তে ইহসান পাওয়া আবহমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

**বেলায়তের প্রকার ভেদ:** বেলায়ত অর্জনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী রয়েছে। প্রণালী ভেদে বেলায়ত অর্জনের ধারা চার প্রকার। **যেমন:** (এক) বিল আসালত, যার অর্থ মূলগত বা প্রকৃতিগত। সুফিবাদের পরিভাষায় যাকে মাদারজাত বা জন্মগত অর্জন বলা হয়ে থাকে। এটি বিনা রেয়াজতে ও পরিশ্রমে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে তাঁর নিয়মে নির্ধারিতভাবে পাওয়া যায়; এই বেলায়ত দাওরায়ে সামাবি বা অসমানি নির্দেশে ও প্রাকৃতিক আবর্তন-বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত সময়ে খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। এই বেলায়ত যিনি লাভ করেন তাঁকে আজলী বা মাদারজাত অলী বলা হয়।

(দুই) বিল বেরাসত, এর অর্থ রহানী উত্তরাধিকারী হিসেবে পাওয়া বেলায়ত। যাকে সুফি পরিভাষায় বলা হয় ‘বিল অলায়ত’।

(তিনি) বিদ্বারাসত, জাহেরি ও বাতেনি (প্রকাশ্য ও গোপন) শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে যে ‘এলমে লাদুন্নী’ হাসেল হয় বা আসে তাকে বিদ্বারাসত বলে। এ বিষয়টির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলে পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে মুসা (আ.)-এর হয়ে খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং খিজির (আ.) এর কাছ থেকে জাহেরি (প্রকাশ্য) শিক্ষার মাধ্যমে বাতেনি (গোপন) শিক্ষা লাভ বা জ্ঞান অর্জন। গাউসে সামদানি হয়ে বড়পীর সাহেব কেবলার বাণী, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমি মহাপ্রভুর কাছ থেকে কুতুব হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি।<sup>১</sup>

(চার) বিল মালামাত, নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে যে বেলায়তে মিলে, সুফি পরিভাষায় তাকে ‘হসুলে মোখালেফাতে নফস’ বলা হয়। এর অর্থ, কেউ তার

ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম করে সেটিকে কষ্ট দিয়ে নিজের আত্মার বশীভূত করতে পারলে তার মধ্যে আল্লাহতায়ালার দেয়া যে শক্তি আসে তাকে বলে বিল মালামাত। এ ধরনের বেলায়ত অর্জনকারীকে মালামিয়া অলী বলা হয়। ‘জেয়াউল কুতুব’ গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় হাজী এমদাদ উল্লাহ (র.) এ ধরনের বেলায়তকে সাভারিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। এই মালামিয়া তুরিকার প্রতিষ্ঠাতা হয়ে আবু সালেহ হামদুল্লা কাস্সার; তিনি ১৭১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন (তাসাওউফে ইসলাম ২২৩-২৩০ পৃ. দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বিনের কলন্দরী, তাইপুরী<sup>২</sup> ইত্যাদি নামেও এই

বেলায়তকে অভিহিত করে থাকেন। কলন্দরী, হয়ে আলী কলন্দরের (র.) সাথে সম্পর্কযুক্ত। হিন্দুস্থানের কলি শরিফ ও পানি পথ, উভয় জায়গায় তাঁর মাজারপাক রয়েছে। একই দিনে তিনি উভয় স্থানে দাফন হন। তিনি তৌহিদে আদীয়ান মজহাবের অনুসারি ছিলেন। ‘তাসাওউফে ইসলাম’ নামের গ্রন্থের ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠায় তৌহিদে আদীয়ান বা ধর্ম ঐক্য সম্পর্কে লেখা রয়েছে। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, যত রকমের ধর্ম আছে সেগুলোতে অবস্থা অনুসারে বিভিন্নতা থাকলেও তারা মূলতঃ অভিন্ন। বাইরের দিক থেকে একটি ধর্ম অন্যটির মতো নাও হতে পারে, এই পার্থক্যটা বাহ্যিক।

কিন্তু যাকে ধর্ম বলে ডাকা হয়, এই ধর্মবন্ধ অভিন্ন ও এক। যেহেতু সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যস্থল খোদা। যদিও বিভিন্ন ধর্মের সাথে বিভিন্ন গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট, এটা ও আল্লাহতায়ালারই ইচ্ছা। এই মতবাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (র.), উমর ইবনুল ফরিদ, হযরত জালালুদ্দিন রুমি (র.), হযরত আবদুল করিম জিলি (র.), হযরত বায়েজিদ বোন্তামি (র.)। তাইপুরী, হযরত আবু এজিদ বায়েজিদ বোন্তামি (র.)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তিনি ২৬১ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

বেলায়তের স্তরভাগ বা বিভিন্ন সীমানা: বেলায়ত, বিভিন্ন স্তরের দিক দিয়ে তিনি স্তরে ভাগ হয়েছে।

১. বেলায়তে সোগরা: যাঁরা বেলায়তী ক্ষমতা লাভ করার ক্ষেত্রে সাধারণ মোমেন বা বিশ্বাসীদের উপরে স্থান পেয়েছেন।

২. বেলায়তে ওসতা: যাঁরা বেলায়তী ক্ষমতায় ফেরেশ্তার উপরে মধ্যম মর্যাদা লাভ করেছেন।

৩. বেলায়তে ওজমা বা কোবরা: এই স্তরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা বেলায়তী অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেছেন। তাঁরা এমনই ক্ষমতার অধিকারী হন যে সমস্ত সৃষ্টি জগতে তাঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিরাজমান থাকে। এই বেলায়তী অর্জন করেছেন এমন অলী-কে বেলায়তে ওজমা’র অধিকারী বা শ্রেষ্ঠ অলী বলা হয়। এই বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদায় উঠে আসা মহান আল্লাহতায়ালার অলীগণের মসরবকে (কাজের ধারাকে) দুই ভাগে ভাগ করা

**উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদীযুল মসরব ও হযরত শীষ (আ.) থেকে আহমদীযুল মসরব আরম্ভ হয়। হযরত রসূল আকরাম (দ.)-এর দু'টি নামের মধ্যে বেলায়তী মর্যাদার সাথে জড়িত নাম  
‘আহমদ’ মহান  
আল্লাহতায়ালার প্রথম  
সৃষ্টি।**

হয়েছে। ধারা দু'টো হলো, কুতুবিয়ত (কর্মকর্তৃত্ব) এবং গাউসিয়ত (ত্রাণকর্তৃত্ব)। গাউসিয়ত বা ত্রাণকর্তৃত্বে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে গাউসুল আয়ম বলা হয়। গাউসুল আয়ম মর্যাদার অধিকারী অলীর আবির্ভাব বিল আসালত বা প্রকৃতিগতভাবে, তাঁরা জন্মগতভাবেই অলী হন এবং মহান আল্লাহতালার নির্দেশে সৃষ্টি জগতের মঙ্গলময় ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হন। কুতুবিয়ত বা কর্মকর্তৃত্বে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদায় উঠে আসা অলীকে কুতুবুল আকতাব বলা হয়। তিনি আল্লাহতায়ালার নির্দেশে সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা বিধানের সর্বময় কর্মকর্তারূপে বিরাজমান থাকেন।<sup>৩</sup>

মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর রয়েছে দু'টি নাম, একটি আহমদ এবং অপরটি মোহাম্মদ। আহমদ সৃষ্টির আদিতে গোপন, সূক্ষ্ম জগতে সৃষ্টি রহস্যের মূল আধাররূপে বিরাজ করছিলেন। মোহাম্মদ (দ.) এই বিশ্বজগতে মঙ্গলময় আণকর্তা হিসাবে বিকাশ লাভ করেন। এই পবিত্র নাম দু'টির প্রভাবে সমস্ত নবী এবং অলী, আহমদী ও মোহাম্মদী এই দু'টি মসরবে ভাগ হয়েছেন। গাউসিয়তের উৎস হচ্ছে মোহাম্মদীযুল মসরব এবং কুতুবিয়তের উৎস হচ্ছে আহমদীযুল মসরব।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হ্যরত আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদীযুল মসরব ও হ্যরত শীষ (আ.) থেকে আহমদীযুল মসরব আরম্ভ হয়। হ্যরত রসূল আকরাম (দ.)-এর দু'টি নামের মধ্যে বেলায়তী মর্যাদার সাথে জড়িত নাম ‘আহমদ’ মহান আল্লাহতায়ালার প্রথম সৃষ্টি। হ্যরত মুসা (আ.)-কে আল্লাহতায়ালা বলেছিলেন, ‘হে মুসা! তুমি বনি ইসরাইলকে বলে দাও, যে কেউ আমার কাছে আসবে, কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি ‘আহমদ’কে অস্বীকারকারী হয়, তবে তাকে দোয়খে নিক্ষেপ করবো’। হ্যরত মুসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে খোদা! আহমদ কে?’ আল্লাহতায়ালা উত্তর দিলেন ‘আমার ইজত (সম্মান) এবং জালালিয়তের (মাহাত্ম্যের) কসম (শপথ) করে বলছি, তিনি ছাড়া বেশি সম্মানিত আমার কাছে আর কেউ নেই। যাঁর নাম আমার নামের পাশে আরশের (সর্বব্যাপি আল্লাহতায়ালার কুদরতি আসন) উপর আসমান জমিন (নভঃস্থল ও ভূতল) চাঁদ সূর্য সৃষ্টি করার বিশ লাখ বছর আগে লিখে রেখেছি।’<sup>৪</sup> দিওয়ানে নূরে মোহাম্মদীর ৬৭ পৃষ্ঠায় মাওলানা রূমী (র.)-এর মসনবী শরিফে উল্লেখ আছে: এই জগতে আহমদের দ্বিতীয় জন্ম। তাঁর নূরী জাতের (পবিত্র আলোক সত্তা) মধ্যে শত শত কেয়ামত নিহিত।<sup>৫</sup>

**নবীয়ে সালাসা:** হ্যরত ইব্রাহীম (আ.), হ্যরত ঈসা (আ.) এবং হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.), এই তিনজন নবীর নবুয়তের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁদের মসরব সম্বন্ধে বুরো যাবে। যেমন-

**নবুয়তে ইব্রাহীম:** হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) মোহাম্মদীযুল মসরব নবী এবং তাঁর বেলায়তী যোগ্যতাকে শহুদীয়া মসরব বা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়। তিনি চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এই সত্য উপলব্ধি করেন যে, মহান আল্লাহতায়ালাই বৃহত্তম শক্তির মলিক, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো অনিত্য, অস্থায়ী। আল্লাহতায়ালাই চিরসত্য, চিরস্থায়ী। এই জ্ঞানদর্শন যুক্তির মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের

পর্যায়ভুক্ত, নবুয়তের সাথে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। এই পর্যায়ের মসরব বা সত্য অনুসন্ধানী ধারার মাধ্যমে (রুচির মাধ্যমে) যা অর্জিত হয় তাকে মোহাম্মদীযুল মসরব বলা হয়। (চলবে)

সারান্বাদ : ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

## সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৎস্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দু'টোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে বগড়া করে না, কেউ বগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহর সাথে লিঙ্গ রাখে।
- রংজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াকুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল ন্যৰ্তা বা বিনয়।

-হ্যরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)

# উম্মাহাতুল মুমিনিন হ্যরত খাদিজা (রা.)

## সর্বকালের উম্মতগণের গরিয়সী মা

### ● মোঃ গোলাম রসূল ●

মহান আল্লাহ এবং মহানবী (দ.) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সংশোধনের মাধ্যমে সাহাবা কেরামগণকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহ রাবুল আলামীন কোরআন শরিফে সাহাবাগণের ব্যাপারে বলেছেন, “তাঁরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমিও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট।” এর আওতায় মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর ১৩জন স্ত্রী (যাঁরা উম্মাহাতুল মুমিনিন নামে পরিচিত) নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো : হ্যরত খাদিজা (রা.), হ্যরত সাওদা (রা.), হ্যরত আয়েশা (রা.), হ্যরত জয়নব (রা.), হ্যরত হাফসা (রা.), হ্যরত জয়নব বিনতে খোয়ায়মা (রা.), হ্যরত উম্মে সালমা (রা.), হ্যরত জুরাইরিয়া বিনতে হারিস (রা.), হ্যরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.), হ্যরত সুফিয়া বিনতে হুইয়ি (রা.), হ্যরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.), হ্যরত রায়হানা বিনতে শামউন (রা.), হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)

**হ্যরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর পরিত্র কবর**

মুক্তির কাছে জান্নাতুল মোয়াল্লায় ১৯৯৬ সালে ঐ কবর জিয়ারত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নবী পত্নীরাও আল্লাহর বিশেষ এক উপহার। আল্লাহ তাঁর প্রিয়জনের পূর্ণতা প্রয়োজনে তাঁদের চয়ন করেন। মহান আল্লাহর প্রতি যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের নিকট নবীপত্নী মাত্রই মাতার মর্যাদায় স্বীকৃত। তাই মহান আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, “নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাঁদের প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তাঁর (নবী (দ.) এর) পত্নীগণ তাদের (বিশ্বাসীদের) মাতা [৩৩:৬]।” তাঁর আসল নাম খাদিজা এবং উপনাম ছিল উম্মে হিনদ। তাঁর উপাধি “তাহিরা” অর্থাৎ পরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, শুভ-হৃদয়া শুদ্ধাচারিণী।

**হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়**

এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও, হ্যরত খাদিজা (রা.) হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাবা আক্রমণকারী আবরাহার হস্তীকে ভিত্তি করেই হস্তীবর্ষ গণনা করা হয় এবং সে মোতাবেক ৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে মা খাদিজা (রা.) কুরাইশ

বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খুয়াইলিদ একজন ব্যবসায়ী এবং শিক্ষা-দীক্ষায় বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বংশধারার চার পুরুষ আগে মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তাঁর মাতার নাম ফাতিমা (রা.) বিনতে যায়েদ এবং তাঁর পিতৃকুল অভিন্ন।

মা খাদিজা (রা.)-এর আলোকময় আত্মার সম্মিলনে মুক্তির জ্যোতির্ময় তরুণ মুহাম্মদ (দ.)-এর জীবনে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তার স্বাক্ষর আল-কুরআনে রয়েছে। যেমন, “বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে- (৯:৭১)।”

**মা খাদিজা (রা.)-এর কিশোরী জীবন**

মা খাদিজা (রা.) শিশুকাল থেকেই ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। পিতা-মাতার সীমাহীন আদরে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। খাওয়া পরার জন্য কান্নাকাটি, অবাধ্যতা, চক্ষুলতা এসব কিছুই তাঁর মধ্যে ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাঁর আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তার তেমন আকর্ষণ ছিল না। বরং মাকে অনুসরণ করতেন এবং মায়ের কাজ-কর্ম অনুশীলন করতেন। সত্যিই এক অভিন্ন চরিত্রের খাদিজা হিসাবেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর সব কিছুতেই স্বতন্ত্রভাব পরিস্কৃতিত হতো।

**মা খাদিজা (রা.)-এর শিক্ষা জীবন**

তাঁর সময়ে পূর্বে নায়িলকৃত ধর্মগ্রন্থ তৌরাত ও ইঞ্জিল এর নির্দেশনা ও তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু রচিত হতো। তাঁর পিতা খুয়াইলিদ একজন শিক্ষিত ধর্ম-বিশারদ ছিলেন। ফলে পারিবারিকভাবেই তিনি শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছেন। ধীরে ধীরে তিনি এক শিক্ষিতা মহিয়সী নারী হিসাবে বড় হয়ে উঠলেন। ফুটফুটে চেহারার শিশুকন্যা কিশোরী থেকে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তখনকার আরবে তাঁর মত অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। তিনি অসাধারণ সব গুণের

অধিকারিণী হওয়ায় আরবের লোকরা তাঁকে “খাদিজাতুত তাহিরা” নামে ডাকতেন। যার অর্থ নির্মল চরিত্রের অধিকারিণী পরিত্ব কন্যা।

### মা খাদিজা (রা.)-এর বিবাহের প্রস্তাব

তাঁর মত পরিত্ব হৃদয়ার বিবাহের প্রথম প্রস্তাব উঠে তাঁর চাচাতো ভাই সুবিখ্যাত পণ্ডিত ওয়ারাকা বিন নওফেলের সঙ্গে-যা কার্যকরি হয় নাই। অনেক বিয়ের প্রস্তাব এলেও খুয়াইলিদ তেমন শুরুত্ব দেন নাই। আরবের বৎশ গৌরব একটা বড় ব্যাপার ছিল। তাই উচ্চ বংশীয় সুদর্শন যুবক আবু হাওলার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে তার পিতার সঙ্গে মুক্তায় বসবাস শুরু করেন। কিন্তু আবু হাওলার অকাল মৃত্যু হয়। তাঁদের সুখের সংসার বেশিদিন টিকল না।

মা খাদিজা (রা.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ হয় সন্মান পরিবারের আতিক ইবনে আইস মাখজুমীর সঙ্গে। তাঁর এক কন্যা সন্তানের জন্মের পরই তিনি মারা যান।

জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। দু'বার স্বামী হারাবার পর পরিবার একটু হতাশ হলেন এবং বিবাহের ব্যাপারে তাদের অনীহা দেখা দিল। কিন্তু মা খাদিজার চাচাতো ভাই সাঈফী ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এল। এই সুশিক্ষিত যুবকের সঙ্গে মা খাদিজার তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিছুদিন পর সাঈফীর মৃত্যু হয়। ভাগ্যের পরিহাস মা খাদিজা (রা.) আবার বিধবা হন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, সাঈফীর সঙ্গে মা খাদিজার বিবাহ হয় নাই। কেউ কেউ বলেছেন, তৃতীয় বিবাহ ইসলামের প্রাণপুরুষ রাসূল (দ.)-এর সঙ্গেই হয়েছিল।

### মা খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ

মা খাদিজা (রা.) জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় দারুণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পিতা বৃদ্ধাবস্থায় তাঁকেই ব্যবসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ৫৯০-এ সংঘটিত হয় ফিজারের যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে খুয়াইলিদ মারা যান। এবার মা খাদিজা (রা.) এতিম হয়ে গেলেন।

শোক, দুঃখ যতই থাকুক না কেন, মা খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসায়ে মনোযোগ দিলেন এবং সৎ ব্যবসায়ের সবগুলো কৌশল ব্যবহার করে বিকাশ ও উন্নয়নমুখী অবস্থানে ব্যবসাকে দাঁড় করালেন। তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ,

তদারক প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ এবং বিশ্বস্ত একজন মানুষের খোঁজ করতে লাগলেন। অপরদিকে হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী হিসাবে সুনাম ইতিমধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মা খাদিজা (রা.)-এর নিকটও এ খবর অজানা থাকে নি। তাই তিনি মুহাম্মদ (দ.)-কে একজন লোকের মারফত ডেকে পাঠালেন। হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) মা খাদিজা (রা.)-এর সাথে দেখা করলেন। মা খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসার ভার নেয়ার জন্য মুহাম্মদ (দ.) কে অনুরোধ করলেন। তখন মুহাম্মদ (দ.) তাঁর চাচা আবু তালিবের অনুমতি চাইলেন এবং আবু তালিব খুশী হয়েই অনুমতি দিলেন। অতএব, মুহাম্মদ (দ.) মা খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসার ভার নিলেন। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কাফেলা তৈরী হলো এবং মুহাম্মদ (দ.) দামেক্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জেরুজালেম, হাইফাসহ অন্যান্য কেন্দ্রে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে মুহাম্মদ (দ.) প্রভৃত লাভ করলেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুহাম্মদ (দ.) ফিরে এলেন এবং অর্থ-কড়ি সঠিকভাবে মা খাদিজাকে বুঝিয়ে দিলেন এবং মা খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (দ.)-এর প্রাপ্য কড়ায়-গণ্য দিয়ে দিলেন।

### রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব

বাণিজ্য সফর শেষে মা খাদিজার পরিচালক মাইসারার নিকট থেকে আল-আমীন মুহাম্মদ (দ.)-এর আচার-আচরণ, মেধা, দক্ষতা সব কিছুর বর্ণনা যা পেলেন তাতে মা খাদিজা (রা.) আল-আমীনের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন তাঁর বিশ্বস্ত আতীয়া নাফিসা বিনতে উমাইয়াকে দিয়ে মুহাম্মদ (দ.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। এই সময় মা খাদিজার বয়স ৪০ এবং আল-আমীনের বয়স ২৫ বছর। কিন্তু বয়সের পার্থক্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। মুহাম্মদ (দ.) চাচা আবু তালিবের অনুমতি সাপেক্ষে সম্মতি দান করলেন। অপরদিকে মা খাদিজা তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদের অনুমতি নিলেন। উভয়ের অভিভাবকগণ বিয়েতে রাজী হলেন এবং মা খাদিজা (রা.)-এর বাড়িতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিয়ে হলো। খোৎবা দিলেন পিতৃব্য আবু তালিব। মোহর ধার্য হয় ৫০০ দিরহাম। তবে কেউ কেউ বলেছেন ২০টি উট মোহরানা বাবদ ধার্য হয়। তবুও কিছু ষড়যন্ত্রকারী এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট হয়ে মা খাদিজা (রা.) কে এক ঘরে করেছিলেন। তখন তিনি তাদের দাওয়াত দিয়ে ভোজসভা করে শান্ত করেন এবং তাদের উপস্থিতিতে মহানবী

(দ.) কে সকল প্রকার ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেন।

মা খাদিজা (রা.)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ মহানবী (দ.) গরীব-মিসকিনদের মাঝে বিলি করে দেন। এখানে সকল নারী-পুরুষের জন্য বিরাট শিক্ষা আছে যে, তাতে পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসা মোটেই নষ্ট হয় নাই। রাসূল (দ.)-এর সহধর্মীনী হিসাবে মা খাদিজা (রা.) অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এভাবে নবী-পত্নী হিসাবে মা খাদিজা (রা.) সব সময় দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন।

হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) সর্বদা আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন এবং হেরো পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। মা খাদিজা (রা.) খাদ্য শেষ হয়ে গেলে, সেখানে কষ্ট করে খাদ্য-দ্রব্য ঠিকমত পৌঁছিয়ে দিতেন। এটাই তাঁর খেদমত ও আনুগত্যের লক্ষণ। ঐ হেরো পর্বতের গুহায় উঠতে আমার ১৯৯৬ সালে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। কিন্তু উঠার পর দেখলাম এক মহাজ্যোতি ঐ স্থানটিকে আলোকিত করে রেখেছে। তখন আমি ২ রাকাত নফল নামায সেখানে আদায় করেছিলাম।

### রাসূল (দ.)-এর নবুওয়াত প্রকাশ

বিবাহোভর জীবনে মা খাদিজা (রা.) নবুওয়াতের প্রস্তুতিকাল দেখেছেন। বেশ কয়েক বছর (প্রায় ৫ বছর) রাসূল (দ.) হেরো গুহায় মহান আল্লাহর ধ্যানে কাটাতে লাগলেন এবং তাঁর বয়স ৪০ বছরে উপনীত হলো। অবশেষে পবিত্র রম্যান মাসের ২৭ তারিখে জিবরাইল (আ.) এর আবির্ভাব ঘটল। তিনি রাসূল (দ.)-কে আলিঙ্গন করে বললেন, “পড়ুন”। রাসূল (দ.) জবাবে বললেন, “আমি পাঠক নই।” তখন জিবরাইল (আ.) এভাবে তিনবার তাঁকে আলিঙ্গন করে পড়তে বললেন। তৃতীয়বারের চাপ শেষে রাসূল (দ.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হলো—“ইকরা বিস্মি রাবিকাল লায়ী খালাক-----।” অর্থাৎ পড়ুন! আল্লাহর নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর প্রতিপালক অতি দানশীল। যিনি লেখনির সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না” (সুরা আলাক ৯৬:১-৫)। কুরআনের উক্ত আয়াত নাযিল হলো। জিবরাইল (আ.) চলে গেলেন। রাসূল (দ.) বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং সতৰ ঘরে ফিরে এসে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “আমাকে আবৃত কর”।

মা খাদিজা (রা.) কম্বল দিয়ে রাসূল (দ.) কে আবৃত করে

সান্তুনা দান করলেন এবং অভয় দিলেন, “আপনার কোন ভয় নাই; আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করেন, আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ করেন, দুঃস্থদের সেবাযত্ত করেন, অতিথিকে আপ্যায়ন করেন, ঘোর বিপদেও সত্য পথ অবলম্বন করেন, মহান আল্লাহ আপনাকে বিমুখ করবেন না, আপনাকে দিয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন।”

এরপর জিবরাইল (আ.) বলছেন, “হে মুহাম্মদ (দ.) আপনি, আল্লাহর রাসূল (দ.), আর আমি জিবরাইল (আ.)।” তখন মা খাদিজা (রা.) ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট সব ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং নওফেল বললেন, “খাদিজা! আমি শপথ করে বলছি, মুহাম্মদ (দ.) নিশ্চয়ই আখেরী যামানার পয়গম্বর বিশ্ব রসূল (দ.)।” মা খাদিজা সতৰ ঘরে ফিরে এলেন এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (দ.)-এর স্ত্রী হওয়ার জন্য নিজিকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করলেন।

### মা খাদিজার ইসলাম গ্রহণ

রাসূল (দ.) একদিন চাদর আবৃত অবস্থায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় জিবরাইল (আ.) ওহী মারফত জানালেন, “হে চাদর আবৃতকারী! উঠুন, সতর্ক করুন। আপনার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।” (সুরা আল-মুদাস্সির) সর্বপ্রথম রাসূল (দ.) মা খাদিজা (রা.)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছালেন। মা খাদিজা (রা.) সান্দ চিত্তে বললেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন।

### মা খাদিজা (রা.)-এর সন্তান-সন্ততি

রাসূল (দ.)-এর সঙ্গে ২৫ বছর যাবত ঘর-সংসার করেন মা খাদিজা (রা.)। তাঁর ৪টি কন্যা ও ২টি পুত্র সন্তান এ সময়ের মাঝে জন্মহৃৎ করেন। কন্যাগণ হলেন: হ্যরত যয়নব (রা.), হ্যরত রুকাইয়া (রা.), হ্যরত উম্মে কুলসুম (রা.) এবং হ্যরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রা.). পুত্র সন্তানগণ হলেন: হ্যরত কাসেম ও হ্যরত আব্দুল্লাহ এবং তাঁরা অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন।

### মা খাদিজা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন জিবরাইল (আ.) মহানবী (দ.)-এর নিকট এসে বললেন, আল্লাহত্তায়ালা

হয়রত খাদিজা (রা.)-এর প্রতি সালাম দিয়েছেন। রাসূল (দ.) তাঁকে একথা জানালে মা খাদিজা (রা.) জবাব দিয়েছিলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা নিজেই সালাম। জিবরাউল (আ.)-এর প্রতি আমার সালাম এবং আপনার প্রতি আমার সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ।” তাহলে সালামের গুরুত্ব কতবেশী তা সকলকেই অনুধাবন করতে হবে। রাসূল (দ.)-এর সুখে-দুঃখে সর্বদাই তিনি পাশে থাকতেন এবং অনেক সময় ঢাল হিসাবে কাজ করতেন। কাফেরগণ রাসূল (দ.) ও তাঁর পরিবারবর্গকে “শেয়াবে আবু তালিব” নামক পাহাড়ে প্রায় দুই বছর আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তখন তাঁরা গাছের পাতা, চামড়া খেয়ে থাকতেন এবং এই দুঃসময়েও মা খাদিজা (রা.) রাসূল (দ.) কে সান্ত্বনা দিতেন ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ সুরা বাকারায় (১৫৫, ১৫৬ নং আয়াতে) ঘোষণা করেছেন, “নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখব ভয়-ভীতি দ্বারা, ধন-প্রাণ ও শস্যহানি দ্বারা। হে রাসূল! আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা বিপদে আপত্তি হলে বলে থাকে যে, আমরা আল্লাহরই এবং আমরা সকলে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল।” তাই এত বিপদাপদের মধ্যেও দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত দিতে রাসূল (দ.) বিরত থাকেন নি। কাফেরদের লিখিত বয়কটের শর্তাবলী কাবা শরিফে তারা টাঙিয়ে রেখেছিল। একদিন আবু তালিব কুরাইশ কাফেরদের সভাস্থলে ঘোষণা করলেন যে, ঐ শর্তাবলী নষ্ট হয়ে গেছে। তখন তা দেখে তারা সত্যিই ভেঙে পড়লো। এ সময় জোহায়ের ও মোতায়েম প্রমুখ বীরগণ রাসূল (দ.) ও তার পরিবারবর্গকে গিরি সংকট থেকে মুক্ত করে আনলেন।

চাচা আবু তালিব ৮০ বছর বয়সে ইত্তিকাল করার পর হয়রত খাদিজা (রা.)-এর সময় ঘনিয়ে এল। তখন হয়রত ফাতিমা (রা.) তাঁর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তিনি তাঁর আক্রাজানের খেদমতে কোন অবহেলা করবেন না। তখন মা খাদিজা (রা.) রাসূল (দ.)-এর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তাঁর হাতের উপর মন্তক রেখে ৬৫ বছর বয়সে ইত্তিকাল করেন। এ বছরকে দুঃখের বছর হিসাবে উল্লেখ করা হয়। রাসূল (দ.) নিজ হাতে মা খাদিজা (রা.) কে মক্কার জান্নাতুল মোয়াল্লায় “হাজন” নামক স্থানে দাফন করেন।

“আল ইসতিয়াব” গ্রন্থে উল্লেখ আছে: “মহানবী (দ.) কাফিরদের কাছ থেকে অস্বীকার এবং বিরোধিতায় যে দুঃখ পেতেন, মা খাদিজা (রা.)-এর কাছে এলে তা দূর হয়ে

যেত। কেননা, মা খাদিজা (রা.) তাঁর সমস্ত কথা সত্য বলে স্বীকার করতেন এবং বিধর্মীদের কথা তাঁর সামনে হালকাভাবে ব্যাখ্যা করতেন।” এ এক অনিবাচনীয় শ্রদ্ধা যা পার্থিব জীবন ও পারত্বিক জীবনকেও সুশোভিত করে। হয়রত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) ঐ চিরস্তন প্রেম, ভালবাসা ও সন্তুষ্মবোধের গৌরবান্বিত এক নাম, সর্বকালের উম্মতগণের অনুসরণীয় গরিয়সী মা জননী।

**তথ্যসূত্র:** ১. কোরআন শরিফ। ২. মহিলা সাহাবী, তালিবুল হাসেমী। ৩. মহিলা সাহাবী ও বেহেশতী রমণীগণ-মোছাম্মান আমেনা বেগম। ৪. বোখারী শরিফ।

## সুফি উদ্ধৃতি

- **কুস্তিভাবাপন্ন আলিম অপেক্ষা**  
সুস্তিভাবাপন্ন ফাসিকের সাহচর্য উত্তম।
- **আল্লাহর নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের**  
কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই লজ্জা।
- **স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহর**  
ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার  
নাম রোজা।
- **তাওবার অবস্থা তিনটি।** যথাঃ (১) আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (২) পাপ কাজ বর্জন করার দ্রুত সঞ্চল করা,  
আর (৩) জুলুম ও ঝগড়া থেকে  
নিজেকে পাক রাখা।
- **সত্যবাদীর নাম হল সততা।** যে  
ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়,  
সে-ই সিদ্ধীক।

-হয়রত জুনাইদ বাগদানী (রহ.)

# গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

## ● অধ্যাপক জহুর-উল-আলম ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লামা শের-এ বাংলা সৈয়দ আজিজুল হক

আল কাদেরী (রহ.)

হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা বর্ণনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শের-এ বাংলা আল কাদেরী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, “কুতুবুল আলম, গাউসুল আয়ম, খোদার পরিচয় লাভকারীদের কাঁবা, কাশ্ফ ও কারামাতের ভাণ্ডার, ফয়জ বা কল্যাণধারার উৎসস্থল, কামালতের উৎসস্থল, উচ্চ মর্যাদাসমূহের ধারক, হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদ উল্লাহ কাদেরী মাইজভাণ্ডারী চাটগামীর প্রশংসাবাদ।

ঐ সুলতানের জন্য অজস্র-হাজার প্রশংসাবাদ আমাদের খাজা গাউসুল আয়ম (হযরত) আহমদ উল্লাহ (মাইজভাণ্ডারী)-এর নিমিত্তে প্রশংসাবাদ। তাঁর এ (গাউসুল আয়ম) উপাধি শাহানশাহে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মহান দরবার থেকে এসেছে। এমন সুসংবাদ আউলিয়ে কেরামের মুখেও শুনা গিয়েছে। হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ কাদেরী পূর্বাঞ্চলে বেলাদতপ্রাপ্ত (জন্মগ্রহণকারী ও বিকাশলাভকারী) কুতুবুল আকতাব। ঐ শাহে মাইজভাণ্ডার হলেন গাউসুল আয়ম-ই, তিনি হযরত আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চেরাগে হোয়ায়ত বা আলোকবর্তিকা। পয়গম্বরকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাতে বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দু'টি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল (যা বেলায়তে মোকায়্যাদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোতলকায়ে আহমদী বলে বুঝা যায়)। তৎমধ্যকার একটি নিঃসন্দেহে হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ (ক.) এর শির মোবারকে প্রতিষ্ঠিত।”

গাউসুল আয়ম হযরত শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে এ ধরনের সুস্পষ্ট মতামত দানকারী আল্লামা আজিজুল হক শের-এ বাংলা আল-কাদেরী (রহ.) চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী উপজেলার মেখল গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত স্থানীয় মাদরাসায়। পরবর্তী সময়ে ভারতের ফতেহপুর মাদরাসায় হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে আসেন। এ সময় মুসলিম জনসমাজে মহানবী (দ.) এর শান-মান-মর্যাদা

সম্পর্কে এক ধরনের কদর্য-বিতর্ক চলছিল। হযরত শের-এ বাংলা (রহ.) তখন মহানবী (দ.) সম্পর্কিত জররা পরিমাণ মর্যাদাহীন উক্তি ওয়ায়েজ-মুনায়ারা প্রভৃতির মাধ্যমে মহানবী (দ.) এর শান-আজমতের বর্ণনা দিয়ে প্রতিপক্ষের বিভাস্তিমূলক অশোভনীয় প্রচারের বিরুদ্ধে বিশাল জনমত গঠন করেন। তিনি ছিলেন একজন সুলেখক-জজবা সৃষ্টিকারী বক্তা। উর্দু-ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর দিওয়ান-ফতওয়া প্রভৃতি মূলত ইংরেজ ইলাহী এবং ইংরেজ রাসূল (দ.) এর প্রামাণ্য দলিল। তাঁর “দিওয়ানে আযিয়” আল্লাহ-আল্লাহর রাসূল (দ.) এর শান বর্ণনাত্তে দেশ-বিদেশের অসংখ্য আউলিয়া-দরবেশ-কলন্দর-ফকিরের শরাফত বর্ণনাসমূহ উচ্চ মর্তবার কাব্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে “মাজমু’আহ-ই ফাতা-ওয়া-ই আযীয়ায়া”, “ঈয়াহহুদ দালালাত” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা।

পার্থিব জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই অনীহ। তাঁর নিজের ভাষায় উল্লেখ করা যায়, “মাই তো বিমারে নবী হোঁ” আমি তো নবীর প্রেম রোগেই ভুগছি। মহানবী (দ.) এর প্রতি প্রেমাকর্ষণের কারণে প্রায় সময় তাঁর হাল-জজবায় ‘কলন্দর’দের মতো আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। মহানবী (দ.) এর প্রতি জররা পরিমাণ অশ্বদাপূর্ণ শব্দ-বাক্য শুনা মাত্রই তিনি ক্রোধান্বিত হতেন। তখন তাঁর কঢ়ে নিঃসৃত হতো আগুনরূপী শব্দবান। তাঁর হাল হয়ে যেতে ভাব বিভোর। নবী প্রেমে শাহাদত কবুল করতেও তিনি ভীত ছিলেন না। তিনি অলি-দরবেশদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করতেন। “দিওয়ানে আযিয়” কাব্যগ্রন্থে তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। চট্টগ্রামের বুকে চিরন্দিয়ায় শায়িত অগণিত আউলিয়ার ঠিকানা তিনি উক্ত ‘দিওয়ানে আযিয়’ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের আশেকে রাসূল (দ.) তার ‘দিওয়ানে’ গাউসুল আয়ম হযরত শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের অবস্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করে আকর্ষণীয় শব্দ-বাক্যে প্রশংসা প্রকাশ করেছেন।

### হযরত মাওলানা মোহাম্মদ শফী (রহ.)

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ শফী (রহ.) হলেন ফটিকছড়ি উপজেলার আজিমনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের বাল্য বয়সের শিক্ষক এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পরহেজগার মুত্তাকী আলেম। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলায়ে আলমের নিকট প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্ত-দর্শনার্থীর সমাগম থাকায় মাইজভাণ্ডার শরিফের সুনাম, সুখ্যাতি এবং পরিচিতি লোকমুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই তখন গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.), সৃষ্টিকুলের প্রশংসা ধ্বনিতে মুখরিত। প্রতিদিন আগস্তকরা তাঁর জন্য নিয়ে আসছেন বিভিন্ন প্রকারের হাদিয়া-তোহফা। একদিন এক ভক্ত তাঁর জন্য নিয়ে আসেন বড় আকারের একটি তরমুজ। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম তা তাঁর বাল্যকালীন উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মদ শফী (রহ.) এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তরমুজটি পেয়ে মাওলানা মোহাম্মদ শফী (রহ.) খুবই সন্তুষ্ট হন। কারণ তরমুজ প্রেরকের খ্যাতি এবং মর্যাদা ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তরমুজটি হাতে নেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর একসময়ের প্রিয় ছাত্রের জন্যে ফরিয়াদ করে বলেন, “এ ধরনের মর্যাদা প্রাপ্তি অবস্থায় ছাত্র তাঁর (উস্তাদ) কথা স্মরণে রাখায় তিনি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁর বিখ্যাত ছাত্রের মর্যাদা এমন পর্যায়ে উপনীত করেন যেন গোলাকার পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাঁর কথা চিরকাল স্মরণ করেন।” এক সময়ের বাল্যকালীন ছাত্র গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম এর জন্য আল্লাহর দরবারে উস্তাদ মাওলানা শফী (রহ.) এর এটি ছিল সন্তুষ্ট দিলের আকুল ফরিয়াদ। শিক্ষকের প্রতি এ ধরনের আচরণ সকল মর্যাদাপ্রাপ্তি ব্যক্তি-ব্যক্তিত্বের জন্য অনুশীলনীয় দৃষ্টান্তও বটে।

### হ্যরত মাওলানা শাহসুফি হাফেজ সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (রহ.)

হ্যরত মাওলানা শাহসুফি হাফেজ সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (১৮৫৭-১৯৬১) পাকিস্তানের হাজরা জিলার ছিরিকোটের অধিবাসী হলেও চট্টগ্রামবাসীর নিকট কাদেরীয়া তুরিকার একজন পীরে তুরিকত, সাহেবে কশ্ফ অলি আল্লাহ হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য মুরিদ, ভক্ত-আশেক আছেন। তাঁর জন্ম ১৮৫৭ সালে। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ ছদ্র শাহ। ছিরিকোটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। সেখানে দীর্ঘ ঘোল বৎসর অবস্থান কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের প্রচারের কাজও সুসম্পন্ন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিজের ভবিষ্যত কর্ম-

পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তাপ্রস্ত হলে সহধর্মীনীর পরামর্শে তিনি ‘মজজুবে সালেক’ আউলিয়া ‘মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম’ রচয়িতা হ্যরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভীর (রহ.) (১৮৪৩-১৯২৩) নিকট বায়াত হন। এরপর মাওলানা হাফেজ সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (রহ.) এর জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। ১৯২০ সালে পীর সাহেবের নির্দেশে তিনি বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে গমন করেন। সেখানে বাঙালী মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিমগ্ন হন। ইতোমধ্যে তিনি হ্যরত আবদুর রহমান চৌরভীর (রহ.) আধ্যাত্মিক খিলাফত প্রাপ্ত হন। তখন চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোক চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন কর্মসম্পাদনের জন্য রেঙ্গুন সহ বার্মার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করতো। সৈয়দ বংশীয় একজন প্রসিদ্ধ আলেম হওয়ায় এবং তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য অবলোকন করে চট্টগ্রামের অনেকে তাঁর নিকট বায়াত হন। তাঁর মুরিদ এবং আশেকদের অনুরোধে তিনি চট্টগ্রাম আগমন করেন। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তাঁর তুরিকত মিশনের বিশাল প্রচার কেন্দ্র। ১৯৫৮ সালে তিনি ‘আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া’ নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর মুরিদ-ভক্তদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘জামিআ আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা’। বর্তমানে চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশব্যাপী এ মাদরাসা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ হিসেবে নিজস্ব ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। একজন প্রখ্যাত পীরে কামেল হিসেবে তিনি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবারের গান-বাজনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, “দেখ তিনি জমানার বাদশাহ আউলিয়া। হৃকুমত তাঁরই। এ বিষয়ে আমি কি বলতে পারি ?”

### হ্যরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)

মাওলানা নজির আহমদ (রহ:) চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আবদুল করিম (রহ:)। তিনি চট্টগ্রামের মুহসীনিয়া মাদরাসা থেকে উলা পাস করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাতার অনুমতি না পাওয়ায় তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করতে পারেন নি। তিনি ‘কামিল’ পর্যন্ত লেখাপড়া না করলেও ব্যক্তিগত অধ্যয়নের কারণে অনায়াসে কামিল হাদিস বিভাগে ক্লাস-

নিতেন। এসময় শুধু ছাত্ররা নয়, অনেক শিক্ষকও তাঁর হাদিস ক্লাসে বসে পড়তেন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা শিখতেন। সুদীর্ঘকাল তিনি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হযরত হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ীর (রহ.) খিলাফত প্রাণ্ত একজন বিশিষ্ট ওলীয়ে কামেল হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম এবং মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে তাঁর এক বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়, “দারুল উলুম মাদরাসার ছাত্র আবদুস সালাম একদা মাইজভাণ্ডার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার পর তদীয় শিক্ষক উক্ত মাদরাসার মোদারেস মাওলানা নজির আহমদ সাহেব তাওবা করিয়ে শান্তি প্রদান সাপেক্ষে তদীয় ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেন- “উহা একটি দরিয়া সদৃশ। দরিয়াতে কী না থাকে? কিন্তু দরিয়ার পানি কি কখনো অপবিত্র হয়? বরং সর্বপ্রকার অপবিত্রতা দরিয়ার লোনা জলের প্রভাবে পবিত্র হয়ে যায়। আদব করিও। এভাবে কখনো আর বলবে না।”

### উর্দু শায়ের (কবি) তোফায়েল আহমদ ‘নাইয়র’

জনাব তোফায়েল আহমদ এক সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে বিভিন্ন মনজিলে ‘নাইয়র’ নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম ভারতের বিহারে। ভারত স্বাধীন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাককালে তিনি জন্মভূমি বিহার ত্যাগ করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) পাড়ি জমান। চট্টগ্রাম শহরের হালিশহরে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি পেশায় আতর ব্যবসায়ী এবং ইলেক্ট্রনিক মিস্ট্রী ছিলেন। দাঢ়ি-গোফ-উস্কো-খুস্কো চুল এবং ময়লা-দাগে ভর্তি পাঞ্জাবী-লুঙ্গি কখনো কখনো প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় তাঁকে রাতে দরবার শরিফে প্রায়শঃ মন্ত হালে হাজির থাকতে দেখা যেত। উর্দু ভাষায় গজল, কবিতা, হামদ, নাত লেখা তাঁর নেশা হিসেবে প্রকাশ পেত। এ সব লিখার সময় তিনি প্রায়শ

সিগরেটের খালি বক্স এর সাদা অংশ, কুড়িয়ে পাওয়া কোন কাগজ সংগ্রহ করে বুক পকেটে থাকা কলম নিয়ে চায়ের দোকান অথবা কোন স্থানে একাকী বসে পড়তেন। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভাব-বিভোর ছন্দ মিশ্রিত কবিতা লিখা সম্পন্ন করতেন। তাঁর লিখার মধ্যে অনায়াসে মন্তী হাল সৃষ্টির মতো শব্দ এবং নিষ্ঠুর অর্থবোধক বাক্য ব্যবহৃত হত।

জনাব তোফায়েল আহমদ নাইয়র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আসেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এ সময় ফটিকছড়ির নানুপুরের সৈয়দ পাড়া নিবাসী প্রখ্যাত কাওয়াল সৈয়দ আবু আহমদ (আবু কাউয়াল) মাইজভাণ্ডার শরিফে

প্রায়শঃ কাওয়ালী পরিবেশন করে সামা মাহফিল করতেন। আবু কাওয়ালকে পরিবেশনের জন্য তিনি প্রায়শ উর্দু গজল-গান-শে’র লিখে দিতেন। তাঁর বিখ্যাত শে’র “ম্যায়হু মন্তে খেয়াল হে ভাণ্ডারী, রো ব রো হে জামালে ভাণ্ডারী” অথবা “সুলতানে অলি দরপে এক আয়া হে ছাওয়ালি, ভাণ্ডারকে ওয়ালি, ভাণ্ডারকে ওয়ালি”-মাইজভাণ্ডারী সামা মাহফিলে হাল-জজবা সৃষ্টিকারী অন্যতম বিখ্যাত শে’র। এ ছাড়া ওয়াকীল কাওয়ালের প্রায় প্রতিটি কালাম জনাব ‘নাইয়র’ লিখে দিতেন। মাইজভাণ্ডারী সামা মাহফিলের কিম্বদন্তী পুরুষ টুনু কাওয়াল (সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ) তাঁর লিখা শে’র পরিবেশন করতেন। ফার্সী শে’র পরিবেশনের জন্য খ্যাত মনু কাওয়ালও তাঁর

**মাইজভাণ্ডার দরবার**  
**শরিফের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য**  
**সম্পর্কে বলেন- “উহা**  
**একটি দরিয়া সদৃশ।**  
**দরিয়াতে কী না থাকে? কিন্তু**  
**দরিয়ার পানি কি কখনো**  
**অপবিত্র হয়? বরং সর্বপ্রকার**  
**অপবিত্রতা দরিয়ার লোনা**  
**জলের প্রভাবে পবিত্র হয়ে**  
**যায়। আদব করিও। এভাবে**  
**কখনো আর বলবে না।”**

লিখিত শে’র পরিবেশন করতেন। মন্তী হালে জীবন যাপনকারী এ সংসার বিরাগী শায়ের তাঁর সুউচ্চমানের শে’র-গজল-গানের জন্য কখনো পারিতোষিক নিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। বড় জোর চা পরিবেশন করলেই তিনি শে’র লিখতে বসে পড়তেন। এতো ছন্দ মধুর ভাবেন্নতো সৃষ্টিকারী গজল শে’র লিখার পারদর্শিতার কারণে তাঁর মধ্যে কখনো আমিত্ব ভাব প্রদর্শনের মতো মুসিয়ানা অথবা আত্ম প্রচার মুখিতা মোটেও লক্ষ্য করা যেত না। সব সময় চলাফেরা করতেন লোক চক্ষুর আড়ালে, লুকিয়ে লুকিয়ে।

জনাব তোফায়েল আহমদ নাইয়র গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর শানে অনেক শে'র লিখেন। তাঁর একটি বিখ্যাত শে'র ছিল গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর অতি সুপরিচিত কারামত বিপদগ্রস্ত ভক্তকে বাঘের আক্রমণ থেকে উদ্বারের লক্ষ্যে 'বদনা নিক্ষেপ' প্রসঙ্গে। তিনি শে'র এর শুরুতে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর পরিচয় দিয়েছেন 'ওয়ালীয়ে ভাণ্ডার' সম্বোধন করে। অর্থাৎ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী হলেন 'ভাণ্ডারের ওলী'। একজন দরিদ্র আশেক ভক্ত পাহাড়ী জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে বাজারে বিক্রয় করে উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের (ক.) জন্য কিছু নাস্তা এবং দুধ নিয়ে আসার নিয়ত করে। কিন্তু পাহাড়ে কাঠ সংগ্রহ করতে এসে হিংস্র বাঘের আক্রমণের মুখে পতিত হলে দরিদ্র আশেক-ভক্ত 'গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী'র নাম উচ্চারণ করা মাত্র অদৃশ্য হতে একটি বদনা বাঘের মুখে পতিত হয়। এতে চিংকার দিয়ে ভীত বিহুল বাঘ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ভক্তকে আক্রমণের পরিবর্তে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভক্তটি উদ্বার প্রাণ হন। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী ঘটনার সময় পুরুর ঘাটে ওজু রত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বড় আকারের বিখ্যাত বদনা। তিনি হঠাতে 'দূর হও' শব্দ করে বদনাটি পুরুরে নিক্ষেপ করেন। এ ঘটনা সবাইকে হতবিহুল করে। উপস্থিত আশেক-ভক্ত-মুরিদরা পুরুরে তন্ম তন্ম করে বদনাটি খুঁজে উদ্বারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু বদনার কোন অস্তিত্বই পুরুরে মিলেনি। এমতাবস্থায় কয়েকদিন পর বদনাটি নিয়ে কিছু নাস্তা সহ দরিদ্র ভক্তি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এসে ঘটনাটি প্রকাশ করেন। এতে একটু মুচকি হেসে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম (ক.) তাঁর পদমর্যাদা সম্পর্কিত সুপ্রসিদ্ধ উক্তি প্রকাশ করে বলেন, "যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করব। আমার সরকারের এ প্রকৃতি হাসর তক জারী থাকবে"। মূলতঃ এ ধরনের বর্ণনার মধ্যে জনাব নাইয়র তাঁর শে'র শেষ করেন।

উদূর্ধ্ব ভাষায় লিখিত বর্ণনাধর্মী এ শে'রটি ছাপা অক্ষর দু'পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়। শায়ের তোফায়েল আহমদ নাইয়র লিখিত শে'রটি 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থকার অছিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে শুনিয়ে লিখিত কপি তাঁর পবিত্র হস্তে হওলা করেন।

**হ্যরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহ.)**  
‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থে উল্লেখিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে প্রশংসনীয় মতামত প্রদানকারীদের একজন

হলেন মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহ.)। তাঁর জন্ম ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটস্থ সলিমপুর গ্রামে। পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে তিনি মহানবী (দ.) এবং সিদ্ধিকে আকবর (রাঃ) এর ৩৩তম ও ৩৫ তম বংশধর বলে উল্লেখ আছে। তাঁর পূর্ব পুরুষ সেলিম কাজী এবং হাসান শরীফ ফৌজদারের নামানুসারে সলিমপুর ও ফৌজদারহাট নামকরণ হয়েছে। চট্টগ্রাম মোহসেনিয়া মাদরাসা, জৌনপুর মাদরাসা, বেনারস এবং উত্তর প্রদেশের রামপুর মাদরাসা আলিয়ায় শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মাওলানা, মুফতি ও মুহান্দিস উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময়ে রামপুরস্থ খানকায়ে এনায়েতিয়ায় হ্যরত শাহ এনায়েত উল্লাহর সান্নিধ্যে এসে ইলমে মারিফাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। চার বৎসর স্থানে অবস্থান কালে শিক্ষকতার পাশাপাশি তদীয় পীরের খিলাফত লাভ করেন। চট্টগ্রামে ফিরে এসে তিনি চট্টগ্রাম মোহসেনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা শেষে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় হাদীস শাস্ত্র বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এ ছাড়া হেকিমী শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে তিনি পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন হেকিমী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান 'হাশেমী দাওয়া খানা' প্রতিষ্ঠা করেন। একই সঙ্গে পাশের একটি কক্ষে তিনি খানকায়ে সফিরিয়ায় তুরিকত কার্য পরিচালনা করতেন। আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদে নিজস্ব খানকাহ এবং হেকিমী প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে শাহী জামে মসজিদের খতিব হ্যরত সৈয়দ আবদুল হামিদ বোগদাদী (রহ.) গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। একসময় আরব ভূখণ্ডে ইসরাইলী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য হ্যরত সৈয়দ আবদুল হামিদ বোগদাদী (রহ.) প্যালেস্টাইন গমনের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহ.) সাহেবকে মসজিদের খতিব এবং ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিয়ে যান। উল্লেখ্য যে, হ্যরত সৈয়দ আবদুল হামিদ বোগদাদী (রহ.) প্যালেস্টাইন যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। তিনি ৪৪ হাজার হাদীস কঠিন রেখেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১২ এপ্রিল আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন খানকায় তিনি ইন্তিকাল করেন। একবার তাঁর জামাতা মাওলানা আবদুল হক মরিয়মনগরীকে মাইজভাণ্ডারী বলে ঠাট্টা করেন। এতে মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি জামাতাকে খুবই তিরক্ষার করেন এবং বলেন যে, মাইজভাণ্ডার দরবার সমক্ষে যেন ভবিষ্যতে কিছু না বলেন। কারণ উক্ত দরবারের শান খুবই বড়। এটি তোমাদের বোধগম্য হবে না। (চলবে)

## গ্রন্থ: দ্য সুফি অর্ডারস ইন ইসলাম এবং গবেষক জে. স্পেনসার ট্রিমিংহামের একটি মুখ্যবন্ধ

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা অদ্য আগ্রহে যখন থেকে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ (Mysticism) চর্চা শুরু করেছেন, তখন দেখা গেলো এর সাংগঠনিক কাঠামো, আধ্যাত্মিক নিয়ম-নীতি, ব্যাপকভাবে অবহেলার শিকার। মুসলমানদের এই অধ্যাত্মবাদ যদিও একান্তভাবে এ ধরনের চিন্তাধারার কবিদের কবিতা এবং স্বষ্টাতত্ত্ববিদদের (THEOSOPHISTS) লেখালেখির ভিত্তির উপর রয়েছে, কিন্তু বলা যায় এখনো এবিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা দেয়া হচ্ছে। আলোকিত অনুসন্ধানী বা গবেষকদের অন্তর্দৃষ্টিতে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ বোধগম্য হওয়ার জন্য বোৰা দরকার যে, এটির রয়েছে বাস্তব শৃঙ্খলা।

ইসলামের যে অধ্যাত্মবাদ তার নিয়মকানুন সম্পর্কে আধুনিক কোনো অধ্যয়ন-গবেষণা নেই। এতদ্বিষয়ক অগ্রগণ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে আলজিয়ার্স থেকে প্রকাশিত লুইস রিন (LOUIS RINN) এর লেখা গ্রন্থ ‘মারাবাউতস এত খাউয়ান (MARABOUTS ET KHOUAN)’। যদিও এই গ্রন্থটি প্রাথমিকভাবে আলজিরিয়ার সাথে সম্পর্কিত, তবু এটি এখনো পর্যন্ত ইসলামী অধ্যাত্মবাদ আলোচনায় একটি মূল্যবান ভূমিকা হিসেবে গণ্য। বিশেষ করে যখন থেকে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ নিয়ে অধ্যয়ন-গবেষণা এবং এতদ্বিষয়ক প্রকাশনা সম্প্রসারিত হয়ে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হলো- এ লে শেটেলিয়ারস (A.LE SHATELIER) এর গ্রন্থ ‘লেস কনফ্ৰেৰিস মুসুলমানিস ডু হেজাজ (LES CONFRERIES MUSULMANES DU HEDJAZ)’।

এরই সাথে সাথে আরো অধ্যয়ন-গবেষণা আত্মপ্রকাশ হতে শুরু করলো ইসলামী অধ্যাত্ম সাধনার সুনির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি তৃতীকা অথবা ইসলামী অধ্যাত্ম সাধনার স্থান সমূহকে নিয়ে। এর মধ্যে বিশেষভাবে যে স্থানটির নাম আসলো, সেটি হলো উত্তর আফ্রিকা। কিন্তু শতাব্দীকাল ধরে এই স্থানের এবং এখনে চর্চা হওয়া অধ্যাত্মবাদ নিয়ে গবেষণার কোনো উন্নয়ন দেখা গেলো না। যখন থেকে মুসলিম অধ্যাত্মসাধনা নিয়ে আমি অধ্যয়ন-গবেষণা শুরু করলাম- সেটি আমাকে নিশ্চিত করলো যে, এ সংক্রান্ত পূর্বতন কাজের পুনর্নিরীক্ষণ (REASSESSMENT) নতুন করে সম্পাদন করা প্রয়োজন। এই চিন্তার সূত্র ধরে আমার এ সংক্রান্ত গবেষণা কী ভাবে

করা দরকার সে ব্যাপারে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়ে গেলো।

গবেষণাধর্মী আমার এই অধ্যয়ন প্রাথমিকভাবে মুসলিম আধ্যাত্মিক সাধনার রীতিপদ্ধতির বা তৃতীকার (ORDERS) ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি, অতীতের সুফি সাধনার যে আত্মিক একান্ততা সময়ের বিভিন্ন পর্বে মুসলিম সাধকদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে, তার অনুসন্ধান করেছে। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে আরব্য এবং পারস্য অঞ্চল সমূহে, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধানের প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এছাড়া এই অনুসন্ধানকে সমৃদ্ধ করতে অন্যান্য স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদানকেও গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো মূলতঃ এই বিষয়টির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এমনকি একথাও বলা যায় আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো এই বিষয়টির কাঠামোতে সেগুলোর নিজস্ব অবদান রেখেছিলো এবং অধ্যাত্মচার ক্ষেত্রে তৈরি করেছিলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুশীলনমালা (DISTINCTIVE PRACTICES)।

তবে হ্যাঁ, ইসলামী সুফিবাদী অধ্যাত্মসাধনার বুদ্ধিবৃত্তিক (INTELLECTUAL) দৃষ্টিভঙ্গীকে এই অনুসন্ধান-গবেষণায় উপেক্ষা করা হয়নি। কিন্তু গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে নিবন্ধ রাখা হয়েছে ইসলামী সুফি সাধনার আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার উপর। এই দু'টি কর্মতৎপরতা ইসলামী আধ্যাত্মিক সাধনার কর্মপ্রক্রিয়ার বা তৃতীকার (ORDERS), কাঠামোগত পদ্ধতি সমূহের এবং আচার-অনুষ্ঠানের (RITUAL) পেছনে অবস্থান করছে। ব্যাপকার্থে যাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়, আমরা তার মধ্যেই দেখেছি ইসলামী অধ্যাত্মসাধনার বিপুল বৈভব। আর এই বৈভবের বার্তা মুসলিম বিশ্ব বলে যাকে অভিহিত করা হয় তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ইসলামী অধ্যাত্মসাধনা অভিজাত অধ্যাত্মবাদীদের (MYSTICAL ELITE) চেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কম প্রভাব বিস্তার করছে না। [এর সাথে পুরো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের (CHRISTENDOM) অধ্যাত্ম প্রক্রিয়ার কোনো তুলনা চলবে না] ইসলামী অধ্যাত্মসাধনার এই অসাধারণ বিষয়টি আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই সংকটটি তৈরি হয়েছে মূলতঃ আধুনিক জীবনব্যবস্থা ও চিন্তাধারার অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে।

আমি অত্যন্ত শুভ প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাকে সঠিক সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ‘কার্নেগি ট্রাস্টের (CARNEGIE TRUST) প্রতি। বিশেষ করে আমি যখন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘মেম্বার অব দি স্টাফ’ ছিলাম এ সময় কার্নেগি ট্রাস্টের আর্থিক অনুদান ১৯৬০ সালে ইসলামী অধ্যাত্মাবাদ গবেষণায় উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে আমার স্টাডি টুর সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য জুগিয়েছিলো। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো আমার সহকর্মী প্রফেসর নিকোলা জিয়াডেহ (PROFESSOR NICOLA ZIADEH) এর প্রতি। যিনি আমার গবেষণাপত্রের খসড়া যত্নের সাথে পাঠ করেছেন, বিভিন্ন ভুলগ্রন্তি শোধরানোর ক্ষেত্রে আমাকে একাগ্র করেছেন। এমনকি গবেষণার অনেক বিষয়ের বিশদীকরণেও তাঁর সাহায্য ছিলো।

বৈরুত  
সেপ্টেম্বর ১৯৬৯      জে স্পেনসার ট্রিমিংহাম  
                                  J. SPENCER TRIMINGHAM

### দ্য সুফি অর্ডারস ইন ইসলাম গ্রন্থের প্রকাশকাল ও প্রসঙ্গকথা

সুফিবাদ, যাকে ইসলামী অধ্যাত্মাদের একটি অধিক প্রচলিত অভিধা হিসেবে শিরোনাম করে এ বিষয়ে অনেক অধ্যয়ন-গবেষণা হয়ে আসছে। কিন্তু সুফি সাধনার যে আত্মিক শক্তি, যা বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি বা তুরিকার (ORDERS) মধ্যদিয়ে সাংগঠনিক কাঠামোয় (ORGANIZATIONAL ASPECT) স্থাপ্ত ও সৃষ্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছে তা ঐ সব গবেষণায় উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে জে স্পেনসার ট্রিমিংহাম প্রণীত গ্রন্থ ‘দ্য সুফি অর্ডারস ইন ইসলাম’ গ্রন্থটি ইসলামিক স্টাডিজ বা ইসলাম সম্পর্কিত সাম্প্রতিক অধ্যয়ন-গবেষণায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন তথ্য জোগানে একটি অগ্রগণ্য ধ্রুপদি কাজ (CLASSIC WORK) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুফি প্রাতিষ্ঠানিকতা বা সুফি স্কুল সমূহ, এবং এই সাধনার তুরিকা সমূহের সৃষ্টি, প্রচলন এবং বিকাশের ব্যাপারে এই পশ্চিমা পণ্ডিত পরিক্ষার ও বিশদাকারে তার অধ্যয়ন-গবেষণাকে উপস্থাপন করেছেন এই গ্রন্থে। পণ্ডিত ট্রিমিংহাম এ গ্রন্থটিতে সুফিবাদের পেছনে ইসলামী আধ্যাত্মিক সাধনার সত্যিকার যে নিয়মকানুন শৃঙ্খলা রয়েছে তা তুলে ধরেন। এটাই পাশ্চাত্যের আগ্রহী পণ্ডিতবর্গ, পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু

মানুষকে মূলতঃ এই গ্রন্থ পাঠে আকৃষ্ট করে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে (ইসায়ী সন)। ট্রিমিংহাম লিখিত আরো উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে, ‘ইসলাম ইন ইউরোপিয়া (১৯৬৫)’, ‘হিস্টোরি অব ইসলাম ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা (১৯৬২)’, ‘দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম আপন আফ্রিকা (১৯৬৮)’, ইত্যাদি।

লেখকের পুরো নাম আসলে জন স্পেনসার ট্রিমিংহাম। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর তিনি যুক্তরাজ্যের ‘থ্রোন’-এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালের ৬ মার্চ তিনি যুক্তরাজ্যেরই ‘লিংগফিল্ড’-এ মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলস থিয়োলজিক্যাল কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেছেন।

**অনুবাদ ও তথ্য সংকলন:** ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ।

### সুফি উদ্ধৃতি

- চোখের পর্দাই হল সর্বাপেক্ষা বড় পর্দা, যার দ্বারা লোক শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- খাদ্য ভর্তি উদরে কখনও জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হয় না।
- পরহেজগারীর ধনে যার অন্তর পূর্ণ, সেই বড় ধনবান।
- আরিফের জন্য যা অবশ্য পালনীয়, তা হল মাল-দৌলতের প্রতি নিষ্পত্তি থাকা, বেহেশ্তের ভরসা না রাখা ও দোষখের পরোয়া না করা।

-হ্যরত যুন্নুন মিসরী (রহ.)

-হ্যরত বায়েজীদ বোন্তামী (রহ.)

# তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে

● জাবেদ বিন আলম ●

## (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হয়রত শামসিত তাবরীজ (রহ.) এবং আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমীর (রহ.) দর্শন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং জীবনবোধ উপর্যুক্ত দর্শনের নানা ব্যঙ্গনায় নতুন তরঙ্গমালার উজ্জ্বল ঘটিয়েছে। আল্লামা রুমীর (রহ.) দৃঢ় বিশ্বাস মানবদেহে প্রবেশের পূর্বে আত্মা (রহ.) আল্লাহর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে নূরের জলসায় প্রদীপ্ত ছিল। পবিত্র কুরআনে আকাশ সমূহ এবং জগৎসমূহের চিরন্তন আলো রূপে আল্লাহর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ হলেন ‘নূরুন-আলা নূর’। অনন্ত অসীম আলোর মহাসমুদ্র থেকে আলোর পরশে প্রদীপ্ত রহ মানব আকৃতির ক্ষুদ্র দেহের সীমাবদ্ধ পিঞ্জরায় বন্দী হবার পর আলোর অসীম ভূবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদে।

আলোর দরিয়ায় ভাসমান রহ মানব আকৃতির সীমিত পরিসরে প্রবিষ্ট হয়ে পৃথিবীতে আসা মাত্রাই কেঁদে ওঠে। পৃথিবীতে যতোদিন মানব পিঞ্জরে রহ-এর অবস্থান রয়েছে ততোদিন মানব হৃদয় পার্থিব চাহিদা, লাভ-লোকসান, আত্মীয়-পরিজন, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাফেরা করে। আলোর আভায় উজ্জাসিত রহ পৃথিবীর মায়া-কায়ায় মিশে চলতে গিয়ে ঘটনা দুর্ঘটনার সংমিশ্রণে অমাবস্যার অপচ্ছায়া ঘিরে ঘিরে কুচকুচে কালো আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এর সঙ্গে অবরোধ হিসেবে সংযুক্ত হয় বিধি বিধানের বেড়াজাল। মাওলানা রুমী বিধিবিধানের গভীর মধ্যে মানব হৃদয়ের বিকাশকে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী নন। এ কারণে তিনি মায়হাবের ইমামদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা, রীতি, পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তকে সমকালীন চাহিদা হিসেবে সম্প্রস্তুত হয়েছে বলে মতামত পেশ করেন। তাঁর মতে ময়হাবের ইমামরা তাঁদের যুগের চাহিদা অনুযায়ী যে সকল ফয়সালা প্রদান করেছেন নিঃসন্দেহে তা সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীর জনসমাজ সময়ের পরিবর্তনের কারণে নিত্যন্তুন সমস্যা-সংকটে পতিত হচ্ছে। মানুষের জীবনচারে প্রতিনিয়ত যে রূপান্তর ঘটছে তার প্রতিটির সমাধান ইমামদের প্রদত্ত বিধিবিধানে নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কিত পরিবর্তন, বিবর্তন ও

রূপান্তর ধারাকে স্তুতি রাখেন নি। মানব সমাজের জীবন প্রবাহ আল্লাহ কখনো স্থবির রাখেন নি। আল্লামা রুমী (রহ.) ঐশী প্রেমমত্তার মধ্যেও মানব সমাজের বিকাশধারা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবী আবাদ থাকার জন্যে গুপ্তরহস্য গোপন থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এ গুপ্তরহস্য যদি সাধারণে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তবে ইহজগতের আবাদ স্থবির হয়ে যাবে। তখন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, কৃষি, খামার এ সব কাজে মানুষ লিঙ্গ হবে না। আল্লাহর গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত হলে উপর্যুক্তকাজে লিঙ্গ হবার মতো মন-মানসিকতা কারো থাকবে না। সমাজে কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, আচার-অবিচার কিছুই সংঘটিত হবে না। এ অবস্থায় মানুষের খাওয়া-দাওয়া, কোর্ট-কাছারী, হাকিম-জজ, চাকরি-বাকরি সবকিছুই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। আল্লাহর গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হলে সর্বত্র অস্থিরতা বিরাজ করবে। এমনকি সার্বিক অস্থিরতার মুখে ইবাদত-বন্দেগীও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর অনুপম সৃষ্টির অন্যতম রহস্যক্ষেত্র পার্থিব ব্যবস্থাপনাও ভেঙ্গে চৌচির হয়ে পড়বে। আল্লাহ মানুষকে কল্ব প্রদান করেছেন। মানুষের কল্ব আল্লাহর ঘর। আর মুমিনের কল্ব আল্লাহর আরশ। আল্লাহর আরশ সম্পর্কিত অদৃশ্য জগতের সংযোগ স্থলের নাম ‘কশ্ফ’। আল্লাহ যদি সবার কশ্ফ খুলে দেন তা হলে পার্থিব জগত স্থবির হয়ে যাবে। এতে জগতের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পড়বে। তাই কশ্ফপ্রাপ্ত পবিত্র ব্যক্তির জন্যে গুপ্ত তত্ত্ব-তথ্য প্রকাশ করার বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লামা রুমী (রহ.) মারিফাতের গোপন তথ্য প্রকাশের বিষয়ে এ পথের অভিযাত্রীদেরকে অতি সতর্ক পদচারণার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই মানবিক জগতে নিত্যন্তুন জলসায় সৃষ্টি সমস্যা সমাধানে যুগোপযোগী মতামত অত্যাবশ্যক হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। মাওলানা রুমী (রহ.) সমাজ বিকাশের এ ধারাকে প্রাণবন্ত করে ইসলাম ধর্মে গতিশীল ধারার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ জন্য আল্লামা রুমী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, ধন-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন দুনিয়া নয়, দুনিয়া হচ্ছে ধন-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন, ক্ষমতা-আধিপত্য-প্রভাব বিস্তার প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ এবং এ জন্যে যে কোন কর্ম-অপকর্ম সম্পাদন।

ব্যথা-বেদনা, পাপ-তাপদন্ত নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ মাওলানা রূমী (রহ.) সমীপে সান্ত্বনার আশায় গমনাগমন করতেন। পাপী-তাপী দুর্বল নেতৃত্ব মানের অনেক লোকের সমাগম দেখে কুনিয়ার শাসনকর্তা শাহ পরওয়ানা রূমীর ভক্তদের নেতৃত্ব দৈন্য সম্পর্কে কটাঞ্চ করেন। এ ধরনের কটাঞ্চের উভরে হ্যরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমী (রহ.) উল্লেখ করেন- ‘এরা পতিত বলেই তো আমার নিকট আসে, যারা সৎপথে আছে তাদের তো চালকের প্রয়োজন নেই।’ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ফরিক-দরবেশ, আউলিয়া, মন্তান, আলেম-ওলামা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সৎ, মহৎ, পাপী, গুনাহগার, অপকর্মের কারণে অপরাধী সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ স্নোতের মতো প্রবেশ করে। এ নিয়ে কোন কোন মহলে নানা রকম প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে থাকে। আল্লামা রূমীর (রহ.) উপর্যুক্ত মন্তব্যে এ ধরনের অসার প্রশ্নের যথার্থ উভর রয়েছে। অর্থাৎ মাইজভাণ্ডার শরিফ শুধু মাত্র অলি-দরবেশই সৃষ্টি করে না, বরং অসহায়, পাপী, গুনাহগার, বদকারের মুক্তির পথ নির্দেশনায় অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে কবি ফররুজ আহমদ এর বিখ্যাত উক্তি, ‘ফেরেশ্তাদের জন্য নবীর প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন মানুষের জন্য মানবের পথ প্রদর্শক হিসেবে, মানুষের ভুল-ভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে পরিচালকের মর্যাদা দিয়ে।’ এ বিষয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। একবার হ্যরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর বংশধর মাওলানা শাহবুদ্দিন জৌনপুরী মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সমীপে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের কর্মকাণ্ডের এবং নানান ভাবধারার লোকজনের উপস্থিতি এবং অবস্থান দেখে প্রশ্ন করে ছিলেন, ‘হজুর আপনার দরবারে বহু ‘মসরুব’ এর মানুষ দেখছি।’ হ্যরত উভর করেন, ‘মিএঁ! যিছ দোকান মে হার চিজ হ্যায় ওহি আচ্ছা হ্যায়।’ অর্থাৎ যে দোকানে সবকিছুই থাকে সেটি বড় ও শ্রেষ্ঠ।

মাওলানা রূমীর (রহ.) দৃষ্টিতে মহানবীর (দ.) মিরাজ শরিফে স্বৃষ্টি এবং সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান পর্দা উঠে যায়। এ ধরনের দ্বিতীয় কোন ঘটনা আর সংঘটিত হয় নি। মহাকবি দাঙ্গে তাঁর ‘ডিভাইন কমেডি’ মহাকাব্যে ‘মিরাজ’ এর বর্ণনা এনেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ধারণা খ্রিস্টীয় চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। অন্যদিকে আল্লামা রূমী (রহ.) কুরআনের বর্ণনার আলোকে মিরাজকে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থানের বস্তুনিষ্ঠ সীকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মিরাজ মানবজাতির সম্মুখে এমন এক অভেদ সন্তান পরিত্ব অবস্থান চিহ্নিত

করেছে যেখানে পরিত্ব মহামানব হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) ব্যতীত অন্যকোন সৃষ্টির পক্ষে পরম নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি। আল্লামা রূমী (রহ.) মিরাজকে দেখেছেন মানবমর্যাদার সম্মানজনক অবস্থান থেকে। তাই সকল মানুষই মিরাজের প্রত্যাশায় আকুল ফরিয়াদ পেশ করে থাকে। কারণ মানবজাতির চূড়ান্ত চাওয়া হচ্ছে মিরাজ অর্থাৎ মহান আল্লাহর সঙ্গে মিলন।

আল্লামা রূমী (রহ.) রহ জগতে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবলীলায় আত্মসমর্পণের আলোকে আত্মার ঐক্যের সূত্র থেকে বিশ্বমানবের মুক্তি কামনার লক্ষ্যে উপস্থাপন করেছেন এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পাত্র, ভৌগোলিক গণ্ডি, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, অঞ্চলবাদের অচলায়তন ভাঙ্গার লক্ষ্যে লিখেছেন,

‘আমার সত্যিকার পরিচয় উদ্ঘাটনে পরিপূর্ণভাবে সমর্থ নই,  
আমি মুসলিমও নই, ইহুদীও নই,  
কিংবা অন্য কোন মতাদর্শী,  
প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য নয় আমার জন্মভূমি  
হাঁটে না আমার স্বপ্নরা হেথায়,  
চীন কিংবা হিন্দুস্থান- কোথাও পাবে না আমার ঠিকানা,  
আমি এক নাম-নিশানা হীন,  
স্থান-কাল-পাত্র বিহীন  
অপরূপ নিকুঞ্জ নিলয়

প্রেম-ভালবাসার চকিত হৃদয়

সেই অদৃশ্য শূন্যলোকে দোল দোদুলে

নিয়েছি আমি চিরকালীন আলয়।’

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে রূমী (রহ.) এঁকেছেন তুলনাহীন বিশ্ব ভাত্তু এবং সুগভীর মানবতাবোধের উজ্জ্বল চিত্র। কিন্তু মানব স্বভাবের নানামুখি অনৈতিক অশুল্ক পরিবর্তনের প্রকৃতি দেখে রূমীর (রহ.) চোখ অজ্ঞুবার অশুল্ক বিসর্জনে বিগলিত হয়েছে। এটি আল্লামা রূমীর (রহ.) হৃদয়ভাঙ্গা কান্না। এ কান্না স্বজাতির জন্যে নয়, স্বধর্মের গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে নয়। কোন ধর্ম-দর্শন-জীবনবাদের ব্যর্থতার জন্যে নয় বরং মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং মানব জাতির পদস্থলনের কারণে রূমী (রহ.) কেঁদেছেন অবিরত ধারায়। কারণ স্বষ্টির পরম নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষের ‘সর্বশীর্ষে অবস্থান থেকে সর্বনিম্নে অধঃপতন’ মানব মর্যাদাকে বরবাদ করেছে। তাই আল্লামা রূমী (রহ.) বারবার কামনা করেছেন মানবের উত্থান এবং দানবের অবসান। আল্লামা রূমীর (রহ.) মানব মর্যাদার প্রতি উদান্ত আহ্বানের ভিত্তি হচ্ছে পরিত্ব কুরআন।

আল্লামা রূমী (রহ.) বিশ্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পেয়েছেন

মিরাজ শরিফ থেকে। শবে মিরাজ আল্লাহর পানে মানব আকৃতিধারী মহানবী (দ.) এর সফল অভিযাত্রা। নূরের ফিরিশ্তারও আল্লাহর অসীম নূরের জলসায় প্রবেশাধিকার নেই। মানব আকৃতিধারী মহানবী (দ.) এ অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। মিরাজ শরিফ স্পষ্ট করেছে যে, আচার ধর্মে ধর্ম পালন এবং প্রেম দৃষ্টিতে ধর্মাচারে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কারণ ধর্ম হচ্ছে মানবজাতির জন্যে ঐশী নির্দেশনা। এ নির্দেশনায় বলা হচ্ছে ‘স্তুর রঙে রঞ্জিত হও।’ এ রঙ ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হয় অনন্ত প্রেম। কারণ একমাত্র প্রেমই মানুষকে প্রেমাস্পদ আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিতে সক্ষম। ‘দিওয়ানে শামসিত তাবরিজে’ মাওলানা রূমী (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

‘প্রেম হচ্ছে অনন্ত লোক অভিযান,  
প্রতি মৃহূর্তে সে ছিন্ন করে শত সহস্র আবরণ;  
প্রথম পদক্ষেপ তার সংশয় সংসারাশ্রয় ত্যাগ;  
আর শেষ পদক্ষেপ তার পদহীন যাত্রা;  
এই বিশাল ভূবন তার কাছে বর্ণগন্ধ হীন,  
নিজের আত্মার প্রতি অনিমেষ স্থির তার প্রগোদিত চোখ  
দৃষ্টি তার নিষ্কিঙ্গ-দৃষ্টি সীমার বহু দূরে’

অপরূপ অন্যলোকে, অন্তলোক উদ্ঘাটিত হয় সে দৃষ্টিতে কোন সংশয়, রহস্যময়তা থাকেনা প্রশ্ন কন্টকিত জটিলতায়।’ মানবাত্মার অসীম সিংহদ্বার খুলে দিয়ে আল্লাহ, নবী মুহাম্মদ (দ.)-কে মিরাজ শরিফ করিয়েছেন। মানব জাতির জন্যে এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম শিক্ষা। আল্লামা রূমীর (রহ.) ভাষায় ‘লোভ-লালসাহীন মানবাত্মাই কেবল সৃষ্টি করতে পারে অনাবিল প্রেম।’ মিরাজের মর্যাদায় উত্তীর্ণ মানবকে অনুসরণ-অনুকরণ না করে মানুষ অহংকার, দাঙ্গিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ, ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থের দ্বন্দ্বে রক্তপাত হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। আল্লামা রূমীর (রহ.) ভাষায় ‘এই ঈষাই মানুষকে পরিণত করে দানবীয় চরিত্রের প্রতীকে।’

আল্লামা রূমীর (রহ.) দৃষ্টিতে হ্যরত মুসা (আ.), হ্যরত ঈসা (আ.) এবং হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর প্রচারিত ধর্ম এক ও অভিন্ন। অনেক ইউরোপীয় মনীষীর দৃষ্টিতে এটিকে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে ‘আত্মাহামিস্ট’- অর্থাৎ হ্যরত ঈসাইম (আ.) এর অনুসারী। এ অভিন্ন ধর্মের বিকৃতি সাধন ও ভাত্তাতী সংঘাত সৃষ্টির প্রধান ও একমাত্র অনুষ্টক বিপথগামী ‘ইহুদী চক্র’। আল্লামা রূমীর (রহ.) মতে ‘ইহুদী চক্র’ মানে হ্যরত মুসার (আ.) সকল উম্মত নন। বরং ‘ইহুদী চক্র’ বলতে আল্লামা রূমীর (রহ.) মানব জাতির মধ্যে অনৈক্য, বিভাস্তি,

দুরভিসন্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, সংকীর্ণতা, হিংসা-বিদ্বেষ লালনকারী চক্রকে বুঝিয়েছেন। উপমা হিসেবে ‘ইহুদী’ নামটি এ কারণে এসেছে যেহেতু ইহুদীরা হ্যরত মুসাকে (আ.) বার বার বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। ধর্মের ইতিহাসে মিথ্যা উপাখ্যানের ভিত্তিতে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিতর্ক জুড়ে দিয়েছে।

আল্লামা রূমী (রহ.) মানব জাতির ঐক্যের জন্যে চিন্তা ও চেতনাগত সত্যের উপমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, “একটি জায়গায় দশটি প্রদীপ প্রজ্জলিত করলে গঠন প্রকৃতিতে হ্যতো তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়, কিন্তু দীপ খানি হতে যে শিখা ছড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। হে মহান রব! আমরা তোমার প্রেরিত নবী-রাসূলদের মধ্যে কোন প্রকার বিভাজন সৃষ্টি করি না, একশটি আপেলকে যখন মর্দিত রসধারায় রূপান্তরিত করা হয়- তখন আর একশ থাকে না। বহু বিভক্তির কোন অবকাশ মারিফত জগতে নেই, আধ্যাত্মিক জগতে একাধিক্যের কোন প্রয়োজন নেই।”

সেখানে জীবনের কোন স্থূল সংকীর্ণতা বিরাজ করে না।” আল্লামা রূমী (রহ.) তাওহীদের সামিয়ানা তলে সমবেত হয়ে ধর্ম-বর্ণ-জাত-গোত্র নির্বিশেষে মানবজাতির প্রতি ঐক্যের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা বর্তমান সময়ের অন্যতম নন্দিত মতবাদ ‘সেকুলার’ ধারণাকে স্থান করে দিয়েছে। কারণ ‘সেকুলার’ ধারণায় স্তুর সম্পর্কে অধিক মাত্রায় নীরবতা অবলম্বন করা হয় যা ধর্ম ও নৈতিকতা উপেক্ষা সম্পর্কিত বিষয়কে ব্যক্তি ও সামাজিক ভাবে ত্বরান্বিত করে।

আল্লামা রূমী (রহ.) তাই অকপটে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে মানুষ মূলত স্থানহীন। ক্ষণিকের বাসিন্দা-মুসাফির। মানুষ চিরস্থায়ী আবাসন ছেড়ে মাটিতে এসেছে। মানুষকে আবার অবশ্যই মহাস্থানের রহস্যজনক বসত-ভিটায় ফিরে যেতেই হবে। মানবতার মহামিলনের প্রচন্দ আঁকতে গিয়ে আল্লামা রূমী (রহ.) সকল মানব সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “আদিতে আমরা সকলেই ছিলাম কায়াহীন, ছায়াহীন এক পবিত্র আলোকময় সত্তা। সূর্যের মতো একই পদার্থে গড়া এবং অভিন্ন মৌলিক উপাদান। এর ছিলনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্দুমাত্র নির্দশন। আমরা ছিলাম জলের সমতুল্য, গ্রহিবিহীন বিশুদ্ধ নির্মল। সেই পৃতপবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি যখন দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হলো, তখন আকার ধারণ করলো- তখন আত্মার বিচ্ছেদ ঘটল।” অভিন্ন মূল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্নতার শৈলীতে আত্মার ক্রন্দন আল্লামা রূমীর (রহ.) ‘বংশী বিলাপ’। মসনবী মূলতঃ মানব রূহের জলসা ঘরে একাকার অবস্থার বর্ণনা। এ ধরনের উপমা মানব জাতির

ঐক্যের জন্য আল্লামা রূমীর (রহ.) আর্তনাদ। মানবজাতির প্রতি পরিশুদ্ধ নৈতিকতার ভিত্তিতে সত্য এবং ন্যায় নীতির মানদণ্ডে মানুষে মানুষে সত্যনিষ্ঠার আলোকে পারস্পরিক আঙ্গ রেখে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের জন্য আল্লামা রূমীর (রহ.) কর্তৃণ ফরিয়াদ- ‘মসনবী’। তাই বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে আল্লামা রূমী (রহ.) উদ্ভৃত হয়েছেন মানব জাতির ঐক্য এবং বিশ্ব ভাত্তের অনন্য এক পথ নির্দেশক হিসেবে।

### হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.)

বেলায়তে মোত্লাকার দর্শন ভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের অন্যতম সূত্র হিসেবে লেখক বিশিষ্ট তাসাওউফ সাধক হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) এর নাম উল্লেখ করেছেন। তাসাওউফ ধারার ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ সমর্থক এবং শায়খুল আকবর হ্যরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহ.) ভাবশিষ্য হ্যরত আবদুল করিম কুতুবুদ্দীন ইবন ইব্রাহীম আল জিলি (রহ.) ৭৬৭ হিজরী ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের জিলি নামক (জিলান) স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে ইত্তিকাল করেন। তিনি শায়খ শরফউদ্দীন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম আল জাবাতী (রহ.) এর মুরিদ ছিলেন। তিনি রিফায়ী এবং মৌলভীয়া তৃরিকা অনুশীলন করতেন। তবে তিনি কাদেরীয়া তৃরিকার অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়ে শিয়া-সুন্নী মতভেদে প্রকট আকার ধারণ করে। তাঁর এলাকা শিয়া মতবাদে প্রভাবিত ছিল। তবে তিনি ছিলেন গোঢ়ামীমুক্ত এবং স্বাধীন বিবেক-বিবেচনার অধিকারী। ফলে আন্তঃধর্মীয় কোন্দল-কোলাহল এবং প্রচলিত আবেগে তিনি প্রভাবিত হন নি। তাঁর সময়ে মুসলিম জন-অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ভয়াবহ রূপ নেয়। মোঙ্গল আক্রমণে বিপর্যস্ত ইরাক সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষমতা দখলের তাঙ্গে চলে। তখন তুর্কী সেনানায়ক তৈমুর লং এর উত্থান ঘটে এবং তিনি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্থিতি আনতে সক্ষম হন। এ ধরনের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন-রূপান্তরকালীন সময়ে পবিত্র কুরআন এবং সুফি পন্থার ধারায় সংস্কৃতি, দর্শন এবং মরমীয়তার আলোকে হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) এর চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) ভারতবর্ষ এবং ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে কাদেরীয়া তৃরিকা প্রচারকদের অন্যতম একজন ছিলেন। তিনি কায়রো, ফিলিস্তিনের গাজা, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং তাঁর মুর্শিদ ইব্রাহীম আল যবারতীর (রহ.) শিষ্যদের সমবেত করে একটি সুফি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পবিত্র মুক্তা এবং মদীনা শরিফ জিয়ারত শেষে স্থায়ীভাবে ইয়েমেনে বসবাস

করেন।

হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) পারস্যের সোনালী যুগের সুফি প্রতিভা হ্যরত নজম উদ্দীন রাজী (রহ.), হ্যরত উমর সোহরাওয়ার্দী (হ্যরত সিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী), আল্লামা রূমী (রহ.) এবং হ্যরত মাহমুদ সাবিস্তারী (রহ.) এর চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁদের ভাবধারায় এসে তাসাওউফ-মরমীবাদে আল কুরআনের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে তিনি ব্যাপকভাবে অবহিত হন। হ্যরত সোহরাওয়ার্দী (রহ.) এবং আল্লামা রূমী (রহ.) সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলেও হ্যরত নজম উদ্দীন রাজী (রহ.) এবং হ্যরত মাহমুদ সাবিস্তারী (রহ.) সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সীমিত। হ্যরত নজম উদ্দীন রাজী (১১৭৭-১২৫৬) ইরানের ‘রে’ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি সিরিয়া, মিশর, হিজাজ, ইরাক, আজারবাইজান সফর শেষে প্রখ্যাত অলি হ্যরত নাজিমুদ্দিন কোবরা (রহ.)-এর খানকাহতে উপস্থিত হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। এ প্রখ্যাত দরবেশের নিকট তালিমপ্রাপ্ত হয়ে হ্যরত নজম উদ্দীন (রহ.) মারিফতের জগতের খনি অন্বেষণে তৎপর হন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মিরসাদ আল ইবাদ মিন আল মাদ্দা ইলাল মা’দ’। তাঁর লিখিত তফসীর গ্রন্থের নাম ‘আত্মাওলাদ আল নজমিয়া আইনাল হায়াত’। অন্য সুফি ব্যক্তিগত হলেন হ্যরত মাহমুদ সাবিস্তারী (রহ.) (১২৮৮-১৩৪০)। তাঁর জন্ম পারস্যে তাবরিজের নিকটবর্তী সাবিস্তারী শহরে। তিনি শায়খুল আকবর হ্যরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহ.) দর্শন এবং শব্দবাক্যের গভীর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। ‘গুলশানি রাজ’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। অন্যগ্রন্থ হচ্ছে ‘সাদাত নামা’, ‘হকুল ইয়াকীন ফি মারেফাতি রাবুল আলামীন’ প্রভৃতি। বদরুদ্দীন আল আদল নামের সমসাময়িক এক ব্যক্তি সুফি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মতামত সম্বলিত ‘তোহফা আল জামান বি জিকির সাদতে আল ঈমান’ নামে একটি পুস্তিকা লিখেন। হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) উক্ত পুস্তকের সমষ্টি তথ্য খণ্ডন করে মন্তব্য করেন যে, এ ধরনের পুস্তক সারবত্তাহীন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল ইনসানুল কামিল’ বর্তমান সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সুধী-বৃদ্ধিজীবী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) পবিত্র কুরআনের আলোকে আধ্যাত্মিকতার সূত্র বর্ণনা করে সুরাক্ষাকাহাফ এর ১৮:৬৪-৬৫ আয়াত উদ্ভৃত করেন। উক্ত আয়াত সমূহে হ্যরত মুসা (আ.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, “মুসা বিশ্বের সাথে বলল, ‘আরে! আমরা তো এ জায়গাটাই

খুঁজছিলাম।” তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই জায়গায় ফিরে এলো। সেখানে দেখা পেল আমার এক বান্দার, যাকে আমি আমার রহমতে ধন্য ও অন্তর্নিহিত বাস্তবতার জ্ঞান (মারিফাতের জ্ঞান) দান করেছিলাম।” হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) ইলমে মারিফাতের ধারণা বিবৃত করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পৃথিবীবাসীর নিকট আল্লাহ তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অতি সামান্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশধারা বহুবিধ এবং মাধ্যমও নানারকম। তাঁর অন্যতম একটি ‘ইলমে মারিফাত’। এ জ্ঞান প্রচলিত বিধি বিধানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিশেষ জ্ঞান সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা করেন শুধু একান্তভাবে তাঁকে সে জ্ঞান দান করে থাকেন। আর আল্লাহর এ সকল বান্দারা আল্লাহর ইচ্ছাধীন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, যা অনেকাংশে বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সূরা কাহাফে ৬০নং থেকে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বান্দা কর্তৃক আল্লাহর ইচ্ছাধীনে সংঘটিত ঘটনাপঞ্জীর বিশদ বিবরণ আছে। হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) মূলতঃ এ জ্ঞানপ্রদীপ সংগ্রহে অতিতৎপর বান্দা হওয়ায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে তাঁর বিবরণ ওয়াহদাতুল ওজুদ ধারাকে সমর্থন করেছে। তাই হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) লিখেছেন, “যদি তাঁর (আল্লাহর) নূর আদমের ভেতরে প্রক্ষিপ্ত না হতো, ফেরেশ্তাগণ কখনো তাঁর সামনে সিজদাবনত হতো না। ‘আমি আমার রূহ আদমের ভিতরে প্রক্ষেপ করেছি’- এটাই যথেষ্ট, রূহ তার সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়- ওহে বাগড়াটো।” এ মতামতের ব্যাখ্যাকারীরা বলেছেন, “খোদাই খোদায়ে রূহ।” হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) রূহকে পরম সত্য-সান্নিধ্যপ্রাপ্ত নির্দেশ বর্ণনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রূহ ব্যতীত মানব দেহ অসার- মূল্যহীন।’ সুতরাং ‘রূহ আমার (আল্লাহর) নির্দেশ’ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা বান্দার জন্য অত্যাবশ্যক। রূহ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করা গেলে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যাবতীয় কাজ-কর্ম সং্যত ও স্বনিয়ন্ত্রিত পছায় সম্পাদন করা সহজ হয়।

প্রেম সম্পর্কে বর্ণনায় হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) উল্লেখ করেন, “এবং তোমার রূপ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত যখন আমি পড়ি তখন এটি কুরআনের আদেশ ভেবে ভীত হয়ে পড়ি। আমার ঈমান, আমার ইসলাম এবং আমার তাকওয়া- এতে যা কিছু আছে সে সব নিয়ে আমি তোমার রূপে নিজেকে ধৰ্স করে দেবো, নিশ্চয়ই আমি তোমার আদেশের প্রতি অনুগত।” হ্যরত আবদুল করিম

জিলি (রহ.) ঐশী প্রেমতত্ত্বের উদ্দাম-উভাল মন্তব্য আল্লাহর রূপদর্শন নিমিত্তে ‘ফানা’র বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ ফানা ব্যতীত ‘রূহ’ এর হেকমত অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এখানে পরিপূর্ণ ভাবে ‘লা’ (নাই) অর্জন করা ব্যতীত ‘ইলাল্লাহ’ অনুধাবন অসম্ভব। এক কথায় ‘ফানা’ ব্যতীত ‘ইলাহ’র অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া কল্পনাতীত বিষয়। অন্যত্র হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) উল্লেখ করেন, “তিনি (আল্লাহ) নিজের থেকেই নিজের গুণাবলীর নির্দেশন সমূহ প্রকাশ করলেন, তিনি ওসব নির্দেশনের স্রষ্টা হলেন, তাঁর গুণাবলী, নাম ও নির্দেশন- যা কিছু অস্তিত্বশীল সবই তাঁর সত্ত্বসার। আল্লাহ সব কিছুর গঠনে সহায়তাকারী উপাদান।” আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনার পাশাপাশি তিনি আল্লাহর সৌন্দর্য বর্ণনায় বলেন, “যখন বলা হলো, বল (লা ইলাহা) মারুদ নেই, পরম সৌন্দর্য (জামাল) ছাড়া কিছু নেই। যখন বলা হলো, “(আল্লাহ) ছাড়া আমি বললাম, রূপ (হুস্ন) পরিব্যাপ্ত। হ্যরত আবদুল করিম জিলির (রহ.) দৃষ্টিতে ‘জামাল’ হচ্ছে আল্লাহর পরম সৌন্দর্য আর ‘হুস্ন’ হচ্ছে রূপগত সৌন্দর্য। যখন তাঁর (আল্লাহর) ‘হুস্ন’ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে- তখন বিভিন্নভাবে প্রকাশের জন্য তাঁর বিভিন্ন নাম দেয়া হয়।” আল্লাহর সৌন্দর্যকে তিনি ‘জালাল’ তথা প্রভুত্বব্যঙ্গক এবং ‘কামাল’ পরিপূর্ণ শান্ত স্নিগ্ধ ধারায়ও অবলোকন করেছেন। হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যকে ‘হুস্ন’ এর প্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ সহ সকল প্রাণি- ফুল-ফল সবই আল্লাহর ‘হুস্ন’ এর বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্ক অভিন্ন। সত্তা একটি। এই সত্তা হলেন মহান আল্লাহ। তাঁর অজুন্দিয়া মত শায়খুল আকবর হ্যরত মহাউদ্দীন ইবনুল আরাবী’র (রহ.) অনুরূপ। তাঁদের মতামত অনুযায়ী সকল সৃষ্টি আল্লাহর প্রকাশ। সকল সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। অজুন্দিয়া ধারা অনুযায়ী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রেম এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে প্রেমনির্ভর। ‘আল ইনসানুল কামিল’ গ্রন্থে তিনি কয়েকবার গাউসুল আয়ম হ্যরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে ‘আমাদের শায়খ’ মর্যাদায় সম্মোধন করেছেন। তাঁর ‘আল ইনসানুল কামিল’ গ্রন্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে রূহ এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত ধারণার বিস্ফোরণ। তাঁর মতে ‘ফানা’ হচ্ছে আল্লাহতে নিঃশেষ হওয়া। আর ‘বাকা’ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন অবস্থান- আল্লাহর ইচ্ছা এবং অভিব্যক্তির সঙ্গে অবিরাম চলমানতা। তাঁর মতে সুফি হচ্ছেন তাঁরা যাঁদেরকে

আল্লাহ মানবীয় ক্রটি-বিচ্ছুতি থেকে বিশুদ্ধ রাখেন।

হ্যরত আবদুল করিম জিলির (রহ.) লিখা পুস্তক এবং গ্রন্থ সংখ্যা ৩৪টি বলে উল্লেখ আছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল ইনসানুল কামিল’। এ গভে খে ৬৩টি অধ্যায় রয়েছে। তাঁর দর্শন, মতাদর্শ এবং মরমী ধারণা এ গভে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এ গভে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ গভের মূলতত্ত্ব হচ্ছে ‘ইনসানে কামিল’ সম্পর্কিত ধারণা প্রদান। তিনি এ গভে মহানবী (দ.)-কে আল্লাহর ‘আয়না’ (MIRROR) বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মহানবী (দ.) ইনসানে কামিল হিসেবে আল্লাহর ‘আদল’ (IMAGE)। সুতরাং রাসূল (দ.)-কে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে অনুসরণ করা। ইনসানে কামিল বর্ণনায় তিনি বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ‘মধ্যরাতের সূর্য’ পরিভাষাটি অন্যতম। অর্থাৎ ইনসানে কামিল এর অভ্যন্তরের ফলে নিশ্চিথ রাতের ঘুটঘুটে অঙ্ককারের পরিসমাপ্তি ঘটে। সৃষ্টি তখন জেগে উঠে নতুন উল্লাসে। মহানবী (দ.) সম্পর্কে তিনি ‘আল কালামাত আল ইলাহিয়া ওয়া আল ইফাত আল মুহাম্মদীয়া’ পুস্তকে উল্লেখ করেন, বিশ্বজ্ঞান হলো আল্লাহর উৎসের প্রকাশ, আর হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) হলেন ঐশী নির্যাসের কর্মসূচী। অর্থাৎ মহানবী (দ.) হচ্ছেন ঐশী পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত ইনসানে কামিল। ঐশী নৈতিকতা মহানবী (দ.) এর সত্তাগত বিষয়। তাঁর মতে পরিপূর্ণ মানবতা মহানবী (দ.) এর অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

হ্যরত আবদুল করিম জিলি (রহ.) সম্পর্কে বর্তমান সময়ে গবেষকরা অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাঁর মতামত এবং উপমা সমূহ ক্লিয়ে মানব একের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**হ্যরত উমর ইবন আলী আল ফরিদ (রহ.)**

(উমর ইবন ফরিদ)

বেলায়তে মোত্লাকা গভে উন্মুক্ত বেলায়ত ধারা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য হ্যরত উমর ইবন আলী আল ফরিদ (রহ.) (উমর ইবন আল ফরিদ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আরব কবি। তাঁর নামের অর্থ হচ্ছে ‘বাধ্যবাধকতাকারীর পুত্র’। উমর ইবন ফরিদ এর পিতা সিরিয়ার হমা শহর থেকে কায়রোতে আসার পর সেখানে উমর ইবন আল ফরিদ ১১৮১ সালের ২২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনের পনের বৎসর তিনি পরিত্র নগরী মক্কায় অবস্থান করেন। ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি কায়রোতে আল আয়হার মসজিদে ইস্তেকাল করেন। তাঁকে

কারাফা করবস্থানে আল-মুকাভাম আল আরিদ মসজিদের পাদদেশে দাফন করা হয়।

উমর ইবন আল ফরিদ মূলতঃ আরবি ভাষায় একজন প্রতিভাবান সুফি কবি। তিনি আরবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং মহান মরমী কবি। তাঁর অনেক কবিতা বর্ণনামুখী ধারায় লিখা। অনেকে শায়খ উমর আল ফরিদের কবিতাকে আরবি ভাষায় রচিত সর্বোৎকৃষ্ট মরমী পদ্য হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। উমর আল ফরিদের বিখ্যাত দুটি কাব্য গভে হচ্ছে ‘আল্লাহর প্রেম সুরায় উৎপন্ন মন্ত্র’ এবং ‘সুফি পথ’। এই কাব্যগভে মূলতঃ তিনি আল্লাহর প্রেম শরাবের বর্ণনা এনেছেন অকপট ভাবে। মূলতঃ এ কাব্য আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে লিখা এবং আল্লাহর প্রেমে দিওয়ানা’র নামামুখী অনুভূতির বিচ্ছিন্ন প্রকাশ। ‘শরাব’ তাঁর কাব্যে প্রেমনেশা হিসেবে ক্লিপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কাব্যগভে ‘সুফি পথ’ ‘নজমুস-সুলুক’ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত বিরল অভিজ্ঞতার বর্ণনামুখী বিস্কেরণ। ‘সুফি পথ’ সম্ভবত আরবি ভাষায় লিখিত অত্যন্ত দীর্ঘ কবিতা। তাঁর কবিতা সমূহ সুগভীর আধ্যাত্মিক মর্মভেদী ধারাভাষ্য যা সুফিদেরকে এখনো অনুপ্রাণিত করে থাকে।

যুব বয়সে আল ফরিদ নিরানন্দ জীবনে আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিকতার মরণ্যান্থ্যাত ‘ওয়াদী আল মুস্তাদাসীন’ এ গমন করেন। এটি কায়রো নগরীর বাইরে অবস্থিত। কিন্তু এখানে তিনি আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে গভীর কোন উপলব্ধি না পেয়ে অবশেষে উদ্দেশ্যহীন ভাবে শাফেয়ী আইন অধ্যয়নের জন্য মাদরাসায় ভর্তি হন। এ সময় একদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে এক শাক-সবজী এবং ফল বিক্রেতা মাদরাসার দরজার বাইরে মুসলিম প্রথা অনুযায়ী ওজু সম্পন্ন করছেন। কিন্তু তিনি ওজুর নিয়ম অনুসরণ করে তা করছেন না। উমর আল ফরিদ ওজুর শুন্দি নিয়ম বাতলে দিতে চাইলে সবজী-ফলের দোকানদার তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বলেন, “উমর তুমি মিশরে আলোকপ্রাপ্ত হবে না। তুমি মক্কার হিজাজে আলোকপ্রাপ্ত হবে”।

এ ধরনের বাক্য শুনে উমর ইবন আল ফরিদ চিত্তবিমোহিত হয়ে যান এবং ধারণা করেন যে, এ সবজী দোকানদার সাধারণ কোন মানুষ নন। এমতাবস্থায় অতি দ্রুত সঠিকভাবে তাঁর পক্ষে কি করে মক্কা গমন সম্ভব! তখন উক্ত সবজী বিক্রেতা উমর ইবন আল ফরিদের প্রতি মক্কা পৌছার জন্য অন্তর্দৃষ্টি নিষ্কেপ করেন। তখনই ফরিদ অবশ হয়ে যান এবং দ্রুত মক্কারপথে মিশর ত্যাগ করেন। ফরিদের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি তখন আলোকপ্রাপ্ত হন। আলোর সাগরে উর্মি-

উত্তোলনায় তিনি এমন ভাবে অবগাহিত হন যে, এ অবস্থা থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হন নি।

শায়খ উমর ইবন আল ফরিদ মঙ্গায় পনের বৎসর অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে সবজী-ফল বিক্রেতার আধ্যাত্মিক আহ্বানে তাঁর অস্তিম যাত্রায় অংশ নেয়ার জন্যে কায়রো ফিরে আসেন। কায়রো ফিরে এসে তিনি লক্ষ্য করেন যে সবজী-ফল বিক্রেতার অস্তিম মৃহৃত সমাগত। উভয়ের সাক্ষাতকালে তাঁরা পরম্পরারের কল্যাণ কামনা করে বিদায় নেন।

কায়রো ফিরে এসে ইবন আল ফরিদ একজন প্রখ্যাত দরবেশ হিসেবে পরিচিতি পান। এ সময় তিনি বিচারক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং কায়রো নগরীর গণ্যমান্য নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে লিপ্ত হন। তিনি যখন রাস্তায় চলাচল করতেন সাধারণ মানুষ তাঁকে ঘিরে আর্ত-কান্না শুরু করে দিত। তাঁর নিকট আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশায় দোয়া চাইত, তাঁর হস্তে চুমু দিত। উমর ইবন আল ফরিদ মুসলিম আইনের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, হাদিস শরিফের পারদর্শী শিক্ষক এবং কাব্য-কবিতার প্রাঞ্জ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তদানীন্তন মিশ্র সরকারের প্রভাবশালী আমীর-উমরাহবৃন্দ ইবনুল ফরিদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁকে শিক্ষকের মর্যাদাপূর্ণ আসনে রেখে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তাব দেন। আইউবীয় সুলতান আল মালিক আল কামিল তাঁর কাব্য ছন্দের প্রতি এতো আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর জন্যে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ, ইন্তিকালের পরে মাজার নির্মাণ সহ নানা প্রকার প্রলোভনীয় প্রস্তাব দেন। আল ফরিদ এ ধরনের প্রস্তাব বিন্দু ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে শুধু মাত্র আল্লাহর অনুগ্রহনির্ভর জীবনের প্রতি ভরসা রাখার কথা জানিয়ে দেন। অবশ্য আল আয়হার মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিবারের বসবাসের জন্য একটি বাসস্থান বরাদ্দ করে দেন।

মহানবী (দ.)কে অত্যুজ্জ্বল ঝলকে স্বপ্নে দেখার পর আধ্যাত্মিক উরুবৈরে পরমানন্দে অভিভূত উমর ইবন আল ফরিদের আরবি উপাধি হয় ‘যাদারাত’। তাঁর ছেলের বর্ণনা অনুযায়ী উল্লেখ করা যায় যে, মরমী চেতনায় অভিভূত অবস্থায় তাঁর চেহারা এতো বেশী আলোকময় থাকতো যে তখন তাঁকে দেখে সবাই চমকে উঠতেন। হৃদয় চমকানো মুখমণ্ডল এবং দেহের ঝলক লক্ষ্য করে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে দাপাদাপি, নাচ-নাচি শুরু হতো। তিনি অনেক সময় এক নাগারে চল্লিশ দিন কোন প্রকার খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ না করে রোজা পালন করতেন। এ সময় তিনি ঘুম ও বিশ্রাম গ্রহণ থেকেও বিরত থাকতেন।

সুনির্দিষ্ট একটি সময়ে আধ্যাত্মিকতার পরমানন্দে আল ফরিদ

বাজারের কেন্দ্রস্থলে হঠাতে নাচতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজারের সমবেত সকলে তাঁকে ঘিরে নাচতে নাচতে মাটিতে গড়াগড়ি শুরু করেন। এ সময় আল ফরিদ তাঁর সমস্ত কাপড় খুলে খুলে তাদের দিকে নিষ্কেপ করতে থাকেন। উপস্থিত সকলের উপর্যুপরি নাচানাচি এবং আহাজারির এক পর্যায়ে আল ফরিদের পরিধানে শুধু মাত্র অন্তর্বাসটি অবশিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় কিছু লোক তাঁকে ধরাধরি করে আল আয়হার মসজিদে নিয়ে যায় এবং সেখানে বেশ কয়েকদিন ধরে উপর্যুক্ত হালে তিনি মস্ত হয়ে থাকতেন। প্রতি শুক্রবার তাঁর পুত্র আল ফরিদের মাজারে সমবেত হয়ে তাঁর কবিতা সমূহ পাঠ করতেন। এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থান এবং কবিতার বিষয়বস্তু ও ছন্দের সৌন্দর্যে অভিভূত ভঙ্গরা তাঁকে ‘সুলতানুল আশেকিন’ অভিধায় পরম সম্মানের সঙ্গে সমোধন করে থাকেন। উমর আল ফরিদ তন্মুগ্য অবস্থায় বলতেন, ‘আনা হিয়া’- “আমিই সে। আমিই কথা বলি আর আমিই শুনি এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই”। তাঁর এ ধরনের মন্তব্য হচ্ছে ‘হামাউন্ট’- যা হ্যারত মনসুর হাল্লাজ বলতেন।

উমর ইবন আল ফরিদ হলেন মানুষকে ঐশ্বী প্রেম তাড়নায় উদ্বৃদ্ধকরণের এক অনবদ্য উপয়। তাঁর কাব্যের ধারা বাংলা ভাষায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কলমে প্রকাশ পেয়েছে ‘খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহেশ হয়ে রই পড়ে হায়...’। একই সঙ্গে মাইজভাঙ্গাৰী সঙ্গীতে হ্যারত বজলুল করিম মন্দাকিনী (রহ.) লিখেছেন, ‘আমি শরাবি চলেছি পছ্টে সরে দাঁড়াওৱে যতো সুফি গণ...’।

উমর ইবন আল ফরিদ সবজী-ফল দোকানদার থেকে জ্যোতির্মান হয়ে আধ্যাত্মিক উরুজের মাধ্যমে আল্লাহর অকৃত্রিম বান্দার মর্যাদা প্রাপ্ত হন। সবজী বিক্রেতার ঘটনা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাধীন রহস্যময় জগৎ পরিচালনার জন্য নিজের মনোনীত প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন পেশা-বৃত্তি এবং কর্মীর কল্পধারণ করিয়ে জনসমাজে বিচরণ করার সুযোগ করে দেন। তাঁরা মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছদ্মবেশধারী আউলিয়া-দরবেশ। আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা পূরণ করাই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বেলায়তে মোত্তাকা গ্রন্থ ‘তাসাওউফের এ ধরনের রহস্যপূর্ণ পন্থা ও কর্মপদ্ধতির উৎস সম্পর্কে সন্ধান দিয়ে ইসলামের সুফি ধারাকে কালোভীর্ণ করার ভূমিকা পালন করেছে। (চলবে)

# নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

## ● আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ●

আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন আদমকে। পরপর তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে। আর পৃথিবীতে দু'জনকে একসঙ্গে প্রেরণ করেছেন। আদম-হাওয়া দু'জনেই পৃথিবীতে প্রথম মানব-মানবী, যাঁরা আগমন করেছেন একই পরিবেশে- অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। তাদের মাধ্যমে বিস্তৃতি ঘটেছে মানব সমাজের। এমতাবস্থায় পুরুষ ও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে পৰিত্র কুরআনের ঘোষণা আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে। পৰিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দু'জন হ'তে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন”- (সূরা নিসা:৪:১)। মহান আল্লাহ তায়ালার এই বাণী হ'তে এটাই স্পষ্ট যে, মানবমণ্ডলী তথা নর-নারী সৃষ্টিগতভাবে একই সত্তার দু'টি রূপ, নাম ও ধরন। উভয় সত্তাকে আবার ঔরসজাত ও মানবিক সম্পর্কে এই দু'টি দৃঢ়-মজবুত ভিত্তির উপর মিলিত রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে পৰিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে- “হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাঁতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সন্তুষ্ট, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন”- (সূরা হজুরাত:৪৯:১৩)। এভাবে পৰিত্র কুরআন আরো অনেক আয়াতের দ্বারা আমাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে উপস্থাপন করে যে, সৃষ্টিগতভাবে ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নর-নারী সমান।

আবার পৰিত্র কুরআন নারী-পুরুষ উভয়ের শাস্তির ব্যাপারেও সমান বিধান বর্ণনা করে বলেন, “যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে”- (সূরা মায়েদাহ:৫:৩৮)। “ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর”- (সূরা নূর:২৪:২)।

নর-নারী উভয়ের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারের সমতার ক্ষেত্রে আল কুরআন উল্লেখ করে, “সকল মুমিন পরম্পর ভাই ভাই। অতএব (কোন বিবাদ হলে) তোমরা ভাইদের মধ্যকার

সম্পর্ক ঠিক করে নাও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে”- (সূরা হজুরাত:৪৯:১০)। “আর তোমরা লোকদের মধ্যে ফয়সালা করার সময় ‘আ’দল’ বা ন্যায়নীতি সহকারে ফয়সালা কর। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং দেখেন”- (সূরা নিসা:৪:৫৮)। এমনিভাবে ইসলাম শরিয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রেও নর-নারী উভয়ের সমতা বিধান করেছে। যেমন কুরআনের বাণী, “নিশ্চয় সালাত (নামায) নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করার জন্য মু’মিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে”- (সূরা নিসা:৪:১০৩)। “হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোয়া ফরজ করা হয়েছে....”- (সূরা বাকারাঃ:২:১৮৩)। এখানে মুমিনগণ বলে মুমিন নর-নারী উভয়কেই অস্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সমান ভাবে। আখিরাতেও নর-নারী উভয়ে তাদের কৃতকর্মের ফল যার যার আমল অনুযায়ীই পাবে। সেখানেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হবে না। পৰিত্র কুরআনে এসেছে, “পুরুষ ও নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মু’মিন হয় তাহলে তারা জালাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না”- (সূরা নিসা:৪:১২৪)। “অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ভাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কর্মনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীর কর্ম বিফল করি না”- (সূরা আলে ইমরান:৩:১৯৫)। “একথা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম (রোয়া) পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন”- (সূরা আহ্যাব:৩৩:৩৫)।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নর-নারীর সমান অধিকারের কথা উল্লেখ করে পৰিত্র কুরআনের বাণী, “যা কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে সেটা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং যা কিছু নারীরা অর্জন করেছে সেটা তাদের অংশ। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর

ফফল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত”- (সূরা নিসা:৪:৩২)। “আর যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা ভূপ্লেটে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। আর অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ কর”- (সূরা জুমুআ:৬২:১০)।

সামাজিক বন্ধন ও বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম স্ত্রীলোকের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তাদের দেন-মোহর খুশি মনে দিয়ে দাও। আর যদি তারা খুশি হয়ে তা হতে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পারো”- (সূরা নিসা:৪:৮)। হাদিস শরিফেও এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক কুমারী মেয়ে রাসূল (দ.) এর কাছে এসে অভিযোগ করল যে, তার পিতা তাকে এমন লোকের সাথে বিয়ে দিতে চায় যাকে সে পছন্দ করে না। মহানবী (দ.) তাঁকে বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন- (সুনানে আবু দাউদ)। নারীর মর্যাদা ইসলাম ধর্মে এতো সুউচ্চে যে, মহানবী (দ.) ঘোষণা করেছেন, “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত”- (মুসলিম)।

কাজ বা পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীদের পুরুষের মতই অধিকার নিশ্চিত করেছে। আর বর্তমান সময়ে পরিবারে সচলতা নিশ্চিত করতে মহিলাদের পেশা বা চাকুরী গ্রহণ করতে হচ্ছে। পবিত্র হাদিসে এসেছে- হ্যরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত.... নবী (দ.) উম্মে মুবাশ্শিরা আনসারীর (রাঃ) খেজুর বাগানে প্রবেশ করে তাকে বললেন, কে এই বাগান তৈরি করেছে? মুসলিম নাকি অমুসলিম? উম্মে মুবাশ্শিরা বললেন মুসলিম তৈরি করেছে। তিনি বললেন, “কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে, কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর কোন মানুষ, পশু বা অন্য কিছু তার ফল খায়, তাহলে তাও তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে”- (সহিহ মুসলিম)। একজন মহিলা সাহাবি পশু চারণের কাজ করতো। হ্যরত সাদ ইবনে মুয়ায থেকে বর্ণিত, কা’ব ইবন মালেকের একটি মেয়ে সালা পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাচ্ছিল। একটি বকরী আঘাতপ্রাপ্ত হলে সে সেটিকে পাথর দ্বারা জবাই করে দেয়। পরে নবী (দ.) কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, (এর গোশত) খাও”- (সহিহ বুখারী)।

আল্লাহর নবীর (দ.) যুগে মহিলারা কুটির শিল্পের কাজ

করত। সাদ ইবন সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক মহিলা একখানা ‘বুরদা’ নিয়ে আসলো। সাদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘বুরদা’ কি আপনারা জানেন? বলা হলো, হ্যাঁ! এক প্রান্তভাগে নকশা করা বড় চাদর। সে (মহিলা) বললো, হে আল্লাহর রাসূল (দ.) আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে এ চাদর বুনেছি। নবী করিম (দ.) সাথে তার নিকট থেকে সেটি নিলেন। পরে তিনি তা পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন....”-(সহিহ বুখারী)। আর একজন মহিলা সাহাবী নাসিং ও চিকিৎসার কাজ করতেন, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় সাদ আহত হলে....নবী (দ.) নিকট থেকেই যাতে তার সেবা-যত্ন করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তার জন্য মসজিদে তাঁর খাটিয়ে দিলেন....”-(সহিহ বুখারী)। হাফেজ ইবন হাজার বলেছেন, ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কুফাইদা আসলামিয়ার (রাঃ) উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। নবী (দ.) বলেছিলেন তাকে (সাদ রাঃ) কুফাইদার (রাঃ) তাঁরুতে রাখো যাতে আমি নিকটে অবস্থান করে তার সেবা-শৃঙ্খলা করতে পারি- [রাসূলের (দ.) যুগে নারী স্বাধীনতা, ২য় খণ্ড]। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ (দ.) এর যুগে মহিলারা পশু চরাত, কুটির শিল্পের কাজ করতেন নাসিং সহ অনেক কাজে পর্দাসহকারে পুরুষদের মতই অংশ নিতেন।

নারীদের রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রেও সমান অধিকার। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- “পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড় তোমার প্রভু মহান, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না”- (সূরা আলাকু:৯৬:১-৫)। মহান আল্লাহর এই আদেশে সকল বান্দা তথা নর-নারী উভয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয সাব্যস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বাণী, “প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয”- (সুনানে ইবন মাজাহ)। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (দ.) মহিলা সাহাবীদের নির্দিষ্ট দিনে হাদিস শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন- (সহিহ বুখারী)।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভেও নারীদের অধিকার ইসলাম সুনিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহর বাণী, “পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশি

হোক। এ অংশ নির্ধারিত আছে”- (সূরা নিসা:৪:৭)। মাতা-পিতার মধ্যেও সমতার বিধান ইসলাম করেছে। এক্ষেত্রে মাতার সম্মান আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী, “আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের একজন, কিংবা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছালে (তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে) উভ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের ধমকাবে না। তাদের সাথে সদা ভদ্র ব্যবহার করবে, তাদের কাছে দয়ার বিন্দু বাহু অবনত কর এবং বল, হে রব! তাদের দয়া কর যেমনিভাবে তারা আমাকে দয়া করে ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছেন”- (সূরা বনী ইসরাইল:১৭:২৩-২৪)।

মূলত নর-নারী উভয়কে ইসলাম মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিক সহ সর্বক্ষেত্রে সমভাবে মূল্যায়ন করেছে। তবে ইসলামী শরিয়তে কিছু ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে পার্থক্য দৃষ্টি হলেও তাও মূলত শালীনতা, সম্মত, পারস্পরিক শারীরিক আবরণের সৌন্দর্য সমতার জন্যই। এটা সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি মেলে দেখলে বুঝা যায়, ন্যায্য অধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই আপাতদৃষ্টিতে গোচরীভূত পার্থক্য। তবে বিচার-সাম্যের দৃষ্টিতে এটি নর-নারীর যথার্থ মর্যাদার দিক নির্ধারণ করে দিয়েছে।

### নারীর কর্মক্ষেত্র ও ইসলাম

নিজ হাতে উপার্জনের ব্যাপারে উম্মতকে তথা নর-নারী সবাইকে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহর নবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) উল্লেখ করেন, ‘কোন ব্যক্তি তার নিজ হাতে (অর্থাৎ নিজ মেধা ও শক্তিতে) উপার্জিত সম্পদের চাইতে উত্তম কোন কিছু খাদ্য হিসেবে কখনো আহার করে না’- (সহিহ বুখারী)। অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ ফরমান, ‘ব্যক্তি উপার্জনের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যই পবিত্রতম খাদ্য যা সে খায়। আর তার সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত’- (সুনানে নাসাইয়ি)। এই দুটি হাদিস শরিফ হতে বুঝা যায়, ইসলাম শরিয়ত মানুষকে কর্মের প্রতি ব্যাপক ভাবে উৎসাহিত করে। আর এটা নর-নারী সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে ইসলাম কিভাবে কর্মের শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ (আ.) পেশাজীবী ছিলেন। মহান আল্লাহর বাণী, “আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত”- (সূরা

ফুরকান:২৫:২০)। এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন কাসির (১৩০১-১৩৭৩) বলেন, তাঁরা উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই হাট-বাজারে আসা-যাওয়া করতেন। ইসলাম ধর্মের উপর্যুক্ত নির্দেশনা মর্মগত হয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন- “সাম্যের গান গাই-

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।  
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,  
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।  
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,  
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।”

ইসলাম অবশ্যই হালাল উপার্জনকেই উৎসাহিত করে, হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মানুষের কর্মের-জীবিকার উদ্দেশ্য হলো উপার্জন করার মাধ্যমে নিজের পরিবারকে সচ্ছল করা। আর দরিদ্রতা-অভাব-অন্টন দূর করা। দারিদ্র হতে আল্লাহর রাসূল (দ.) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং উম্মতকেও দারিদ্র থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন - (সুনানে আবু দাউদ)। হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) বলেন, দারিদ্র কুফরে (লিঙ্গ হওয়ার কারণে) পরিণত হতে পারে- (বায়হাকী)। অর্থাৎ দারিদ্র মানুষকে কুফরির দিকে ধাবিত করে। আবার ভিক্ষাবৃত্তিও ইসলাম পছন্দ করে না। এ ব্যাপারে তো আমরা সবাই সে সাহাবির গল্পটি জানি। কবি শেখ হাবিবুর রহমান কত সুন্দর করেই না বর্ণনা করেছেন:

“তিন দিন হতে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে। দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে। নাহি পাই কাজ তাই ত্যাজি লাজ বেড়াই ভিক্ষা করি। হে দয়াল নবী, দাও কিছু মোরে নহিলে পরানে মরি। আরবের নবী, করুণার ছবি ভিখারির পানে চাহি, কোমল কঢ়ে কহিল, তোমার ঘরে কি কিছুই নাহি? বলিল সে, আছে শুধু মোর কম্বল এক খানি। কহিল রাসূল, এক্ষণি গিয়া দাও তাহা মোরে আনি। সম্ভল তার কম্বল খানি বেচিয়া তাহার করে, অর্ধেক দাম দিলেন রসূল খাদ্য কেনার তরে, বাকি টাকা দিয়া কিনিয়া কুঠার, হাতল লাগায়ে নিজে। কহিলেন যাও কাঠ কেটে খাও, দেখ খোদা করে কি-যে। সেদিন হইতে শ্রম সাধনায় ঢালিল ভিখারি প্রাণ, বনের কাঠ বাজারে বেচিয়া দিন করে গুজরান। অভাব তাহার রহিলনা আর, হইল সে সুখী ভবে। নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত কর সবে।” (সূত্র: কবি শেখ হাবিবুর রহমান, নবীর শিক্ষা কবিতা)

নর-নারী সবার জন্যই কর্মের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা

ইসলামি শরিয়তে কতুকু গুরুত্বপূর্ণ তা এ ঘটনায় স্পষ্ট করা হয়েছে।

আধুনিক সমাজে শিক্ষিত নারীরা আজ কর্মমুখি। পারিবারিক অসচ্ছলতা দূর করা, নিজের পায়ে দাঁড়ানো ও সমাজ-দেশকে উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যই মূলত নারী সমাজ উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। বাস্তবতা হলো বৈধ আয়-উপার্জন কর্মে নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। কারণ সমাজে প্রায় অর্ধেক অংশ হলো নারী। আর এই অর্ধেকাংশ সব সময় বাকি অর্ধেকাংশের উপর নির্ভরশীল থাকবে, এটা কখনো বাস্তবসম্মত নয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবারে একজনের আয়-উপার্জনের উপর নির্ভর করে চলা সম্ভবও হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে। এছাড়াও নারীদের পেশাগত কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অনেকগুলো আধুনিক দিক রয়েছে বলে গবেষকগণ মনে করেন। সেই দিকগুলো হলো-

১. শিক্ষার সার্বজনীনতা, উন্নতি-অগ্রগতি ও বহুমুখিতার কারণে কিছু পেশায় নারীর যথাযথ মূল্যায়ন।

২. রোগীর সেবা-শুশ্রাব ও পরিচার্যার কাজে, তথা চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায় নারীর বিশেষায়ণ আজ সমাজ ও সময়ের দাবি।

৩. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে এমন কর্মীর প্রয়োজন হচ্ছে যারা প্রয়োজনের মুছর্তে মহিলা যাত্রীদের বিশেষ সেবা দিতে পারে।

৪. মহিলাদের প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়-বিক্রয় ও গৃহকর্মে ব্যবহৃত নানা রকম তৈজসপত্র তৈরি ও সরবরাহ করতে পারে।

৫. সচ্ছলতা ও পারিবারিক ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য।

৬. নারী শিক্ষা প্রসারের ফলে দিন দিন শিক্ষিকার চাহিদা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. নারীরা যেহেতু সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মত কর্মঘন্টা হিসাব করে কাজ করতে সক্ষম নয় এবং তাদের মাতৃত্বকালীন দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন হয়, সেহেতু ঐ সব নারীর স্থানে অন্য নারীদের এনে শূন্যস্থান পূরণ করা হয়।

৮. অধিক সংখ্যক নারী একত্রে কাজ করার ফলে নারীবান্ধব কর্মসূল সৃষ্টি হয়। যেমন বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলোতে হচ্ছে।

৯. তালাকপ্রাণ, বিধবা নারীর নিজের সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তার অভিভাবকের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তা এড়ানোর

জন্য নিজে উপার্জন করতে চেষ্টা করে এবং এমন পরিস্থিতিতে সে উপার্জন কর্মে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

১০. সরকারী উৎসাহ প্রদানের কারণেও নারী সমাজের কর্মসূলমুখি হওয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর পেশাগত কাজে অংশ গ্রহণ বিষয়ে ইসলামি শরিয়তে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এই দিক নির্দেশনাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মিশরের বিখ্যাত গবেষক আল্লামা আবদুল হালীম আবু শুক্রাহ (রহ.) তাঁর রচিত ‘রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা’ (হররিয়াতুর মারআ ফি আ’হদির রিসালাহ) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। পাঠকের সুবিধার্থে তিনি যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা আমরা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

### প্রথম দিক নির্দেশনা

নারীকে পর্যাপ্ত-উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং বিয়ের পর তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। রাসূল (দ.) এর বাণী- “নারী তার স্বামীর পরিবারের সবার তত্ত্বাবধায়ক। সে-ই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল”- (সহিহ বুখারী)। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো যায়। যেমন সহিহ বুখারীর হাদিসে এসেছে, “কেউ যদি তার দাসীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখায় এবং তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে, তবে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে”। অন্য এক হাদিসে উল্লেখ আছে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা দুটি শিশু কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। আমার কাছে সে সময় একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। তখন সে খেজুরটিকে দুই টুকরা করে দুই কন্যাকে দিয়ে উঠে চলে গেল। এই ঘটনা আমি রাসূল (দ.)-কে বললাম। তিনি বললেন, এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়ার আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোয়খের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে”- (সহিহ বুখারী)। এই হাদিসে মেয়েদের প্রতি ‘ইহসান’ করার বিষয়টির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবন হাজার (১৩৭২-১৪৪৯) অনেকগুলো হাদিস উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে (মেয়েদের প্রতি ইহসান করার

অর্থ)- তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা, তাদের বিয়ে দেয়া, তাদের উত্তম রূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা, তাদের ভদ্রোচিত রীতিনীতি শিক্ষা দেয়া, তাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের আচরণ করা, তাদের ভরণপোষণ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সব কাজ করলে মেয়েদের প্রতি ইহসান করা হবে।

### দ্বিতীয় দিক নির্দেশনা

নারীর কাজ-কর্মের সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদন ও কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং ঘোবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য যে কোন পর্যায়ে এবং কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা যে কোন অবস্থাতেই কর্মহীন ও বেকার না থাকা। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকবে তা পেশাগত বা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে। কারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি মূহূর্তের হিসাব তার প্রতিপালকের সামনে দিতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী- “পুরুষ বা নারী যে-ই ভালকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ার পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখেরাতে প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে”- (সূরা আন নাহাল:১৬:৯৭)।

হ্যরত আবু বায়য়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, “বান্দা তার আয়ুক্ষাল কিভাবে ব্যয় করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কি কাজ করেছে, অর্থ-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কি কাজে তা ব্যয় করেছে এবং দেহটাকে কি কাজে নিয়োজিত রেখেছে সে সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হ্যবার আগে তার পা দুটি সরিয়ে নিতে পারবে না- (তিরমিয়ী)।

### তৃতীয় দিক নির্দেশনা

স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করবে আর পিতা তার কন্যার। কিন্তু কোন মহিলার যদি এমন অবস্থা হয় যে তার অভিভাবক হিসেবে এদের কেউ নাই তবে তার ব্যয় বহন করবে রাষ্ট্র। এই তিনটি বিষয়ের দলিল নিচে উল্লেখ করা হলো।

স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করবে- মহান আল্লার বাণী, “পুরুষ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে....- (সূরা নিসাঃ: ৩৪ আয়াতাংশ)। মহানবীর (দ.) এর বাণী, “তাদের (স্ত্রীদের)-কে খাদ্য ও বস্ত্র উত্তমরূপে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য... (হাদিসাংশ, সহিহ মুসলিম)। পিতা তার কন্যার ব্যয় নির্বাহ করবে। হ্যরত আবু হুরাইরা

(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন.... নিজের পরিবার থেকে (ব্যয়) শুরু কর। এটা কি ভাল কথা যে স্ত্রী বলবে, হায়! আমাকে খাবার দাও, নতুন তালাক দাও....সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিলে কার জন্য পরিত্যাগ করছো?- (হাদিসাংশ, সহিহ বুখারী)।

রাষ্ট্র ব্যয় নির্বাহ করার দলিল- হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) বলেছেন, “আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও নির্ভরযোগ্য। মুমিনদের কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর কেউ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা তাঁর ওয়ারিশদের জন্য”। অন্য একটি রেয়ায়েতে আছে, “অপর কেউ অভাগী সন্তান রেখে গেলে তার দায়িত্ব আমার”- (সহিহ বুখারী)। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজের অধস্তনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের উপর যিনি শাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনিও একজন তত্ত্বাবধায়ক। ফলে তিনিও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন”- (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)। সহিহ বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়তে এসেছে, হ্যরত উমর (রাঃ) এক বিধবা-অভাবী মহিলাকে একটি উট, খাদ্যভর্তি দু'টি বস্তা, কিছু নগদ টাকা ও কাপড়-চোপড় দেন।

### চতুর্থ দিক নির্দেশনা

পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক তাই স্ত্রীগণ পেশাগত কাজের জন্য পুরুষের অনুমতি নিবে। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি নিবে এবং কন্যা তার পিতার অনুমতি নিবে। মহান আল্লাহর বাণী- “পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক”- (সূরা আন নিসাঃ:৪:৩৪)।

হ্যরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, “পুরুষ তার পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে... (হাদিসাংশ, সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)।

শরিয়ত ও প্রথাগত বিধান উভয়ই পুরুষকে পরিবারের নেতৃত্ব এবং পেশাগত কাজে স্ত্রী-কন্যাকে অনুমতি দানের কর্তৃত ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই শরিয়ত কোন বিধান বা বৈধতা ছাড়া সে নারীর সমাজের জন্য কোন কল্যাণকর কাজে স্বেচ্ছাচারিতা মূলক বাধা দিতে পারবে না, যেমন পারবে না বিনা প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক কোন কাজ গ্রহণে বাধ্য করতে।

### পঞ্চম দিক নির্দেশনা

মুসলিম নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং পবিত্র ও চরিত্রবান সমাজগঠনের জন্য অবিলম্বে বিয়ে করা বৈধ অথবা

অত্যাবশ্যক। এভাবে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের সদস্যরা নিয়মিত হিসেবে সুন্দর মানসিকতা ও উত্তম নৈতিক চরিত্রগত স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে। পেশাগত কাজ যদি নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখার কিংবা বিনা প্রয়োজনে বিলম্বিত বিবাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা নারীর জন্য মাকরহ বা হারাম বলে গণ্য হবে। অপর দিকে কোন পেশাগত কাজ যদি তার বিবাহ সম্পাদনের সহায়ক হয় তা হলে সেটা হবে তার জন্য বৈধ কাজ।

বিয়ে করা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সুন্নাহ। হ্যরত আনাস ইবন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) বলেছেন, “....আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি কখনো রোষা রাখি, আবার কখনো রাখি না। আমি (রাত জেগে) নামায পড়ি, আবার ঘুমাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এসবই আমার সুন্নাহ (রীতিনীতি)। যারা আমার সুন্নতকে পরিত্যাগ করে তারা আমার নয়”- (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)। অন্য হাদিসে এসেছে রাসূল (দ.) বলেন, “হে যুবক সমাজ! যাদের বিয়ে করার সামর্থ রয়েছে, তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ তা দৃষ্টি আনতকারী এবং গুণাঙ্গের হিফাজত কারী”- (সহিহ বুখারী)।

আর মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে, হ্যরত উরওয়া ইবন যুবারের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে মহান আল্লাহর বাণী-“তোমরা যদি এ আশংকা বোধ কর যে ইয়াতিমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা অন্য পছন্দনীয় নারীকে বিয়ে কর”-(সূরা নিসা:৪:৩)-এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ‘হে ভাগ্নে! আয়াতে উল্লেখিত এসব ইয়াতিম তাদের অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হতো। অভিভাবকগণ তাদের রূপ-লাবণ্য ও সহায়-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে মোহরানা হাস করে তাদেরকে বিয়ে করতে চাইতো। ফলে পূর্ণ মোহরানা প্রদান করে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদের বাদ দিয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে’- (সহিহ বুখারী)।

উক্ত আয়াতে করিমা এবং হাদিস শরিফ দ্বারা যেহেতু ইয়াতিমদের বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাই এর মধ্যে অবিলম্বে কন্যাদের বিয়ে দেয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, মেয়েদের বিয়ে কি প্রাণ বয়স্ক হওয়ার আগে দিবে না পরে দিবে? প্রাণ বয়স্ক হওয়ার

পরে বিয়ে দেয়ার মতটি অধিক নির্ভুল ও বিশুদ্ধতম। এটা এই কারণে যে যাতে তাদের সতীত্ব সুরক্ষিত করা যায় এবং পবিত্রতা পূর্ণতা সাধন হয়, মানসিক স্বাস্থ্য পূর্ণতা লাভ করে। তাই রাসূল (দ.) এটাকে উৎসাহিত করেছেন। নারীর বিয়ের জন্য কোন পেশাগত কাজ যদি সহায়ক হয়, তাহলে তা করা নারীর জন্য উত্তম। আর যদি বিবাহের উৎসাহী পুরুষদের অধিকাংশের আয় পরিবার পালনের মানের নিচে যায়, তবে এই ‘উত্তম’ তখন ওয়াজিবের পর্যায়ে উন্নীত হয়, যখন মেয়ে পক্ষ তাদের মেয়ের বিয়ে সহজলভ্য হওয়ার জন্য এর তাগিদ অনুভব করে। বিয়ের একটি মূলনীতি হলো-“মা লা ইউতাম্মামুল ওয়াজিব ইল্লা বিহি ফাহ্যা ওয়াজিব” বা যার সাহায্য ছাড়া ওয়াজিব সম্পাদন সম্ভব নয় তাও ওয়াজিব। উলামায়ে কেরামের প্রাঞ্জ মত হলো- যার সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিয়ে দরকার, তার জন্য তা ওয়াজিব। নারী-পুরুষ সবার জন্যেই তা সম্ভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে এই যুগে যখন এ বিষয়ে ফেতনা-ফাসাদের বহু উপাদান বর্তমান তখন কোন প্রশ্নই আসে না।

### ষষ্ঠ দিক নির্দেশনা

পারিবারিক-আর্থিক সামর্থ ও সমাজের গভীর মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজ তাকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখুক তা মোটেই সমীচীন নয়। মহান আল্লাহর বাণী-“আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতির স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের এ স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও নাতি-নাতনী দান করেছেন”-(সূরা নাহল:১৬:৭২ আয়াতাংশ)। রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, “হে জাবের! সন্তান কামনা কর! সন্তান কামনা কর!”- (সহিহ বুখারী- সহিহ মুসলিম)। এই হাদিসে ব্যবহৃত আরবি শব্দ হলো ‘আল কায়েস’। ইমাম বুখারী এর অর্থ করেছেন- সন্তান কামনা কর। অন্য হাদিসে আল্লাহর রাসূল (দ.) বলেছেন, “তোমরা অধিক স্নেহশীল ও সন্তান উৎপাদনকারী মহিলাকে বিয়ে করো। আমি তোমাদের সংখ্যাধিকে গর্ব করবো”- (সুনানে নাসাইয়ী)।

### সপ্তম দিক নির্দেশনা

নারী তার ঘর ও সন্তানাদি উত্তমরূপে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিত নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত।

মহান আল্লাহর বাণী- “তার নির্দশনাবলীর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়টি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে

সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি হয়”- (সূরা আর রূম:৩০:২১)। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, “নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে”- (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, “উটের পিঠে আরোহণকারী আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উভয়। যারা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল ও স্বামীর সম্পদের হিফাজতকারী”- (সহিহ বুখারী)।

নারী-পুরুষ ও শিশু সবারই শান্তি, স্বন্তি ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের অফুরন্ত ভালবাসার ছায়ায় মানসিক ও স্নায়বিক শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা প্রয়োজন পরিবারেই। এতে তাদের পেশাগত জীবন ও পারিবারিক জীবন উভয় সুন্দর ও সুখ-আনন্দময় হবে। আর যদি ঘরেই অশান্তি হয় তবে বাইরেও অশান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। শিশুদের বেড়ে উঠার বিভিন্ন পর্যায়ে দরকার পবিত্র পারিবারিক ঘন্ট ও তত্ত্বাবধান। যেমন সন্তানের প্রয়োজন মায়ের স্তন্যপান এবং কমপক্ষে তিনি বছর লালন-পালন। সব মিলিয়ে একজন নারী স্ত্রী হিসেবে এবং একজন মা হিসেবে একটি পরিবারের পরিবেশকে তার সদস্যদের জন্য আনন্দদায়ক, ভালবাসায় ভরপুর ও স্নেহ-মমতার আধারে পরিণত করতে পারে। কিন্তু একজন নারী ছাড়া তা কি ভাবে সম্ভব হবে? তাই নারীকে পেশাগত কাজ করার সময় হিসেবী পদক্ষেপ নিয়ে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। যাতে তার গৃহের দায়িত্বে অবহেলা না হয়। আর পেশাগত কাজেও যেন ব্যাঘাত না হয়। আবার পেশাগত কাজের চাকচিক্য, বাহ্যিক জৌলুস যেন তাকে তার প্রকৃত জীবন ও মৌলিক ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন করতে না পারে।

### অষ্টম দিক নির্দেশনা

দুটি অবস্থায় পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। ১. পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য। ২. মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে নারীদের জন্য ফরয়ে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজ সমূহ আদায় করার সময়। একই পরিবার-সন্তান-সন্তির প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথা সম্ভব আঞ্চাম দেয়ার জন্য

নারী চেষ্টা করবে।

**প্রথমত:** নিজের ও সন্তান-সন্তির জীবিকার জন্য নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন হ্যরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার বাসস্থান থেকে খেজুর আহরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলে, তিনি নবী করিম (দ.) এর কাছে এসে তিনি তা বললেন। এতে নবী বললেন, তুমি বাগান থেকে খেজুর আহরণ করো”- (সহিহ মুসলিম)। এ বিষয়ে সহিহ বোখারীর হাদিস, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা দুটি শিশু কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। আমার কাছে সে সময় একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তা তাকে দিলাম। তখন সে খেজুরটিকে দুই টুকরা করে দুই কন্যাকে দিয়ে উঠে চলে গেল। এই ঘটনা আমি রাসূল (দ.)-কে বললাম। তিনি বললেন, এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়ার আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোষখের আঙ্গন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে”- (সহিহ বুখারী)।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে, যদি স্বামী জীবিত থাকে এবং কর্মক্ষম না থাকে, তবে স্ত্রী কি তাকে তালাক দিতে পারবে? এ ব্যাপারে প্রায় সব ইমামগণের মত হলো, স্বামীকে সে তালাক দিতে বা ত্যাগ করতে পারবে না। তবে স্বামী তাকে জীবিকা উপার্জনের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিবে। স্ত্রী তার উপার্জন হতে স্বামী ও সংসারের খরচ বহন করবে। ইমামগণ আরো বলেন, মহান আল্লাহ হকের অধিকারীর উপর ধৈর্য ধারণ অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন এবং সেই অধিকার ত্যাগ করে তা সদকা হিসেবে গণ্য করেছেন। [এ বিষয়ে হ্যরত আইউব (আ.) এর অসুস্থতা কালীন সময়ে হ্যরত বিবি রহিমার (আ.) জীবিকা উপার্জনের ঘটনা একটি উপমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে।]

অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার উত্তরাধিকার সূত্রেও সম্পদ লাভ করে সম্পদশালী হতে পারে অথবা নিজে কোন কাজ করেও সম্পদশালী হতে পারে, এই ধরনের অবস্থায়ও একই হৃকুম হবে।

**দ্বিতীয়ত:** মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে নারীদের জন্য ফরয়ে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজ সমূহ আদায় করার সময়। প্রকৃতপক্ষে ‘ফরয়ে কিফায়া’ হলো যে ফরয কয়েকজন আদায় করলে সবার পক্ষ হতে আদায় হবে

যায়, আর কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়। পেশাগত কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের কোন প্রয়োজনীয়তা সামগ্রিকভাবে গোটা নারী সমাজের জন্য যে সব কাজ সম্পাদন অত্যাবশ্যকীয় করে দেয় এবং ঐ কাজ যদি প্রকৃত পক্ষে একক ভাবে নারীদের দায়িত্বভুক্ত হয় কিংবা তাতে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা ঐ কাজ প্রকৃতপক্ষে একক ভাবে পুরুষদের দায়িত্বভুক্ত হয়, কিন্তু পুরুষদের একক প্রচেষ্টায় তা সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং নারীদের প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে সমাজের প্রয়োজনের বিবেচনায় ঐ সব কাজ আঞ্চাম দেয়া নারীর জন্য ফরযে কিফায়া। যেমন: নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা-নার্সিং, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান, ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধান, শিশু সংশোধন কেন্দ্র এবং অনুরূপ সমাজসেবামূলক কাজ। আর ফরযে কিফায়া আদায় করার মাধ্যমে অন্য সবাইকে দায়িত্ব হতে মুক্ত করা হয়। তাই এর দ্বারা বিশেষ সওয়াব লাভ করা যায়।

### নবম দিক নির্দেশনা

পরিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য ‘মানদূর’ (মুস্তাহাব, নফল)। ১. দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা, ২. মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, ৩. কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করা।

**প্রথমত:** দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা- হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী হ্যরত যয়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হ্যরত বেলাল (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (দ.)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও আমার কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে সদকা (ব্যয়) করছি তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাঁকে একথা বললাম যে, নবী করিম (দ.) -কে আমাদের নাম বলবেন না। তখন হ্যরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (দ.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, মহিলা দু'জন কে? হ্যরত বেলাল বললেন, যয়নাব। রাসূল (দ.) বললেন, কোন যয়নাব? হ্যরত বেলাল (রাঃ) বললেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, হ্যাঁ! সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। আত্মায়তার (অধিকার রক্ষার) পুরস্কার ও দান করার পুরস্কার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তুমি যে দান করবে, তোমার স্বামী ও সন্তানই তা পাওয়ার অধিক হকদার”- (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)।

উল্লেখ্য হ্যরত যয়নাব (রাঃ) হস্তশিল্পে পারদর্শী একজন মহিলা সাহাবি ছিলেন।

**দ্বিতীয়ত:** মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করার বিষয়ে একটা উদাহরণ দেয়া যায়। ঐ সব মহিলা যাদের মহান আল্লাহ তায়ালা সবিশেষ প্রতিভা, যোগ্যতা ও মমতা দান করেছেন। যেমন: চমৎকার বাকপটুতার অধিকারী মহিলাদের উন্নতমানের উপদেশপূর্ণ, মর্মস্পর্শী কথা বাচনশৈলী ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য। এ সব সহজাত অতুলনীয় মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় প্রয়োজন যাতে তারা ঐ সবের উপর্যুক্ত ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এই সব সহজাত মেধা ও যোগ্যতা মেয়েদের কর্মস্ক্রিয়ে অনেক পুরুষের চেয়েও অধিক সুফল বয়ে আনে।

**তৃতীয়ত:** কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা- হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ‘.... আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাতের অধিকারীণী ছিলেন হ্যরত যয়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ)। কারণ তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন’-(সহিহ মুসলিম)। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ‘.... দ্বিনের ব্যাপারে হ্যরত যয়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ) এর চাইতে উত্তম কোন নারী আমি দেখিনি। তিনি সর্বাধিক খোদাভীরু, সত্যবাদী, আত্মায়তার বন্ধন রক্ষকারী ও সদকাদাতা ছিলেন এবং নিজেকে অধিক মাত্রায় এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন, যার উপার্জন থেকে দান করতেন এবং তার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রয়াসী থাকতেন’- (সহিহ মুসলিম)। হ্যরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার বাসস্থান থেকে খেজুর আহরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলে, তিনি নবী করিম (দ.) এর কাছে এসে তা বললেন। এতে নবী (দ.) বললেন, তুমি বাগান থেকে খেজুর আহরণ করো”- (সহিহ মুসলিম)।

### দশম দিক নির্দেশনা

পেশাগত কাজের চাপ বেশী থাকলে ঘর-কল্নার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা স্বামীর জন্য উত্তম। কিন্তু পেশাগত কাজটি যদি অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, ‘..... আর পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে’- (সহিহ বুখারী- সহিহ মুসলিম)। হ্যরত আসওয়াদ ইবন ইয়াজিদ

(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (দ.) বাড়িতে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, ‘তিনি পারিবারিক কাজে সাহায্য করতেন এবং আয়ান হলে বেরিয়ে যেতেন’- (সহিহ বুখারী)। এছাড়াও রাসূল (দ.) নিজেই তাঁর বকরী দোহন করতেন। নিজের কাজ নিজে করতেন। কাপড় সেলাই করতেন। জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য পুরুষরা বাড়িতে যে কাজ করে থাকে তিনিও তাই করতেন- (আহমদ, সহিহ আল জামে আস-সগির) এবং এসব করতেন গৃহের কাজের জন্য স্ত্রীদের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, তখন নারী পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকলে সে ক্ষেত্রে তা কেমন হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত আমরা উপস্থাপন করছি- ১. “নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর”- (আয়াতাংশ, সূরা মায়েদা:৫:২), ২. “নারীদেরও পুরুষের উপর ঠিক তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে পুরুষদের নারীদের উপর”- (আয়াতাংশ, সূরা আল বাকারা:২:২৮), ৩. “কোন প্রাণসত্ত্বার অধিকারীর উপর আল্লাহ তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না”- (আয়াতাংশ, সূরা আল বাকারা:২:২৮৬)।

### একাদশ দিক নির্দেশনা

স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খরচ করবে। ইবন আব্বাসের (রাঃ) আজাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মায়মূনা বিনত হারেস (রাঃ) তাকে জানালেন যে, ‘তিনি তার এক দাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়েছিলেন কিন্তু সে ব্যাপারে রাসূল (দ.) থেকে অনুমতি নিতে পারেন নি। অতঃপর তার পালার দিনে রাসূল (দ.) তাঁর ঘরে আসলেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (দ.) আপনি কি জানেন যে আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি একাজ করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী (দ.) বললেন, যদি তুমি দাসীটিকে তোমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে তাহলে সর্বাধিক পুরুষার লাভ করতে’- (সহিহ বুখারী- সহিহ মুসলিম)। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী হ্যরত যয়নাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হ্যরত বেলাল (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (দ.)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও আমার কোলের ইয়াতিম শিশুদের জন্য যে সদকা (ব্যয়) করছি তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাঁকে একথা বললাম যে, নবী করিম (দ.) -কে আমাদের নাম

বলবেন না। তখন হ্যরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (দ.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, মহিলাদু'জন কে? হ্যরত বেলাল বললেন, যয়নাব। রাসূল (দ.) বললেন, কোন যয়নাব? হ্যরত বেলাল (রাঃ) বললেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, হ্যাঁ! সে দ্বিতীয় পুরুষার লাভ করবে। আত্মীয়তার (অধিকার রক্ষার) পুরুষার ও দান করার পুরুষার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তুমি যে দান করবে, তোমার স্বামী ও সন্তানই তা পাওয়ার অধিক হকদার”- (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)।

বিভিন্ন কাজে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতি প্রশংসনীয় ব্যাপার। যে পরিবারে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মমত্ববোধ রয়েছে এবং সে পরিবারে এটাই মূল বিষয়। হ্যরত মায়মূনার (রাঃ) এই হাদিস হতে বুঝা যায় যে মহিলারা তাদের উপার্জিত ব্যয় করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। হ্যরত ইবন মাসউদের স্ত্রীর এই হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, স্বামীকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করা ‘মানদূ’ (মুস্তাহাব, নফল)। আর স্ত্রী যখন পেশাগত কাজে আত্মানিয়োগ করে তখন এটার জন্য স্বামীকেও কিছু কষ্ট পোহাতে হয়। আর যদি স্ত্রী তার সম্পূর্ণ সময় গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করতো তবে স্বামীকে হয়তো এই কষ্ট পোহাতে হতো না। তাই স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে কিছু অংশ স্বামীর এই কষ্টের বিনিময়ও হওয়া উচিত।

### দ্বাদশ দিক নির্দেশনা

যে সব কার্য কারণ কর্মজীবী মহিলাদেরকে তাদের পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে তার প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ দায়ী- মহান আল্লাহর বাণী- “মুমিন নারী ও পুরুষরা পরস্পরের বন্ধু”- (আয়াতাংশ, সূরা তাওবা:৯:৭১)।

হ্যরত নু'মান ইবন বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক দয়ামায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে”- (সহিহ বুখারী-সহিহ মুসলিম)।

মুসলিম নারীরা পেশাগত কাজ করতে গিয়ে গৃহের তত্ত্বাবধান ও সন্তানদের পরিচর্যাসহ সব কাজের সমন্বয় করতে গিয়ে যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় বা হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজ তথা এর জনগণ, প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবীগণ দায়ী থাকবেন। এজন্য অনেকগুলো উদ্যোগ

নেয়া যায়। যেমন: ১. নারীর গৃহ ভিত্তিক পেশাগত কাজে সহযোগিতা ও উৎসাহ দেয়া, ২. গৃহভিত্তিক কাজ ও গৃহকর্ম, ঘোথ ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী কাজের গভি বিস্তৃত করা ইত্যাদি।

### অয়োদশ দিক নির্দেশনা

নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে মুসলিম সরকার দুটি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীল: ১. সরকারী কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে, যাতে তাদের পরিবার স্বচ্ছ হয় এবং তাদের স্ত্রীদের পেশাগত কাজে অংশ নিতে না হয়। ২. সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, ‘তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক। তাই নিজের অধীনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, শাসক সব মানুষের তত্ত্বাবধায়ক। সেও তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।.....’- (সহিহ বুখারী)।

### চতুর্দশ দিক নির্দেশনা

যে সব পেশাগত কাজ নারীর প্রকৃতি এবং তার দৈহিক-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূলতা থেকে নারীকে রক্ষা করতে হবে, এধরনের কাজ দুই প্রকার- ১. শরিয়ত প্রণেতা সে সব বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। হ্যরত আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (দ.) বলেছেন, সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যারা তাদের কাজ কারবারের কর্তৃত্ব একজন মহিলার উপর ন্যস্ত করলো”- (সহিহ বুখারী)। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তিতে উপস্থাপন করা হবে। ২. মুসলমানগণ যে সব কাজে নিয়োগ থেকে নারীদের বিরত রাখতে চায়, এর মধ্যে পড়ে এমন সব কষ্টকর দৈহিক কাজ যা চরম শ্রম দাবি করার সাথে সাথে নারীর কাঁধে ভারী বোৰা চাপিয়ে দেয়। তা ছাড়া যে কাজ কষ্টদায়ক মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না এবং যা এমন ঝুঁতা ও কঠোরতার দাবি করে যা তার আবেগ অনুভূতিকে নিষ্ঠেজ করে দেয়। এক কথায় তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে।

### পঞ্চদশ দিক নির্দেশনা

পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। এ সব নিয়ম-নীতির মধ্যে রয়েছে- শালীন পোশাক পরা, দৃষ্টি

অবনত-আনত রাখা, নিভৃতে সাক্ষাত না করা এবং ভিড় এড়িয়ে চলা। অনুরূপ বার বার দীর্ঘ সময় ধরে দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা অর্থাৎ প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের পুরো সময়টাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে একই স্থানে রাখা থেকে বিরত থাকা। তবে কাজের প্রকৃতিই যদি পরস্পর সহযোগিতা ও মত বিনিময় অথবা অন্য কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে নারী পুরুষে পুনঃ পুনঃ, পরস্পর দেখা-সাক্ষাত দাবি করে তাহলে প্রয়োজন অনুসারে তা করতে কোন ক্ষতি নেই।

কিন্তু বর্তমানে যে সব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে তাতে যদি এসব নিয়ম-নীতির কিছু অভাব থাকে তাহলে কি আমরা নারী অথবা সমাজের জন্য কল্যাণকর দিকসমূহ পরিত্যাগ করবে। এবং মুসলিম নারীদের ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধা দিব? নাকি শরিয়ত নির্দেশিত নিয়ম-কানুন পালন করার যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করব? ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধের প্রয়োজন কতটা এবং তা প্রতিরোধ করার পর কতটা কল্যাণ অর্জিত হবে তা পরিমাপ করা শরিয়তের মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব। এ বিষয়ে বিজ্ঞ শরিয়ত বিশেষজ্ঞগণের মত হলো- হারামকে অনিবার্য করে তোলে এমন ফ্যাসাদ বা অনিষ্টকর জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। তবে অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিলে সে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। ফলে ইসতিহাব বা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তা আরো বেশী গ্রহণযোগ্য।

বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে সুস্পষ্ট কল্যাণ লাভের জন্য তা উপেক্ষা করা যায়। যেমন কোন নারীর সাথে নিভৃতে সাক্ষাত করা, সফর করা বা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। কেননা এসব কাজ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্য নারীকে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া সফরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে... এই নিষেধাজ্ঞা এ কারণে যে, এর অবর্তমানে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখনই সুস্পষ্ট কল্যাণ অর্জিত হবে তখন তা আর বিপর্যয়ের সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।

শরিয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো, একই কাজে যখন বিপর্যয় ও কল্যাণ একসাথে দেখা দেবে তখন অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে। (চলবে)

## ফীরি মা ফীরি

### মওলানা রূমীর (র.) উপদেশ বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাতে মোনাফেক (কপট) লোকের কপটতা প্রকাশ পায়। পৃথিবী হয়তো রাতের অঙ্ককারে ঢাকা থাকতে পারে এবং দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যেতে পারে, কিন্তু রাতে কপট লোক সৎ ও আন্তরিক মানুষ হতে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়।

কপট লোক বলে, “যেহেতু কেউই দেখছে না, এমতাবস্থায় কার খাতিরে আমি ভান করবো?” কেউ একজন তো অবশ্যই দেখছেন, কিন্তু মোনাফেকের চোখ একদম বন্ধ এবং সে ওই মহান সত্ত্বকে দেখতেই পাচ্ছে না।

বিপদে প্রত্যেকেই সাহায্য চায়; দাঁতের ব্যথায় ও কানের যন্ত্রণায়, সন্দেহ, ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতায়। গোপনে প্রত্যেকেই আরযি পেশ করে এই আশায় যে, ওই মহান সত্ত্ব তাদের দোয়া কবুল করে প্রার্থনা মণ্ডের করবেন। একান্তে, গোপনে মানুষেরা দুর্বলতা দূর করার ও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে নেক আমল পালন করে এই আশায় যে, ওই চিরঝীব সত্ত্ব তাদের উপহার ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন। যখন তাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয় ও মানসিক শান্তি ফিরে আসে, তখন অকস্মাত তাদের বিশ্বাস মিলিয়ে যায়, আর দুশ্চিন্তার ভূত আবারো ঘাড়ে চেপে বসে।

এমতাবস্থায় তারা আবার আরয করে, “হে খোদা, আমরা এমন-ই এক শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম যখন সমস্ত আন্তরিকতাসহ আমাদের কয়েদখানার কোণা থেকে আমরা আপনার কাছে আরয করেছিলাম। এক’শ প্রার্থনার ওয়াস্তে আপনি আমাদের আবেদন মণ্ডের করেছিলেন। এক্ষণে কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েও আমরা ওই রকম-ই অভাবগ্রস্ত আছি। আমাদেরকে এই অঙ্ককার দুনিয়া থেকে বের করে পয়গম্বর (আ.)-বন্দের আলোকোজ্জ্বল জগতে নিয়ে আসুন। মুক্তি কেন কয়েদখানা ও দুঃখ-বেদনা ছাড়া আসে না? এক হাজারটি ভালো ও ধোকাপূর্ণ উভয় ধরনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গ্রাস করে রেখেছে; আর এসব ভূতের দ্বন্দ্ব এক হাজারটি পীড়ন ও যন্ত্রণা নিয়ে আসে যা আমাদের করে থাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সকল ভূতকে জ্বালিয়ে থাক করা সেই নিশ্চিত বিশ্বাসটি কোথায়?” আল্লাহতালা উত্তর দেন, “তোমাদের মাঝে আনন্দ-ফুর্তির অন্ধেষণকারী সত্ত্ব (নফস) তোমাদের শক্তি এবং আমারও শক্তি। তোমাদের শক্তি ও আমার শক্তি যে সত্ত্ব, মিত্র বলে তাকে গ্রহণ করো না।”

আনন্দ-তালাশী নফস (একগুঁয়ে সত্ত্ব)-কে যখন বন্দী করা হয়, আর সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তখন-ই তোমাদের স্বাধীনতা আগমন করে এবং শক্তি সঞ্চয় করে। এক হাজার বার তোমরা প্রমাণ করেছো যে মুক্তি তোমাদের কাছে এসেছে দাঁতের ব্যথা, মাথায় ব্যথা ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে। তাহলে কেন তোমরা শারীরিক শান্তি-স্বন্তির শেকলে আবন্দ থাকবে? কেন তোমরা শরীরের মাংসের সেবায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকবে? (ওপরের) ওই সূত্রের শেষটুকু ভুলে যেয়ো না: দেহের ওই কামনা-বাসনার জট খোলো যতোক্ষণ না তোমাদের চিরস্তন আকাঙ্ক্ষা তোমরা অর্জন করেছো, আর অঙ্ককার কয়েদখানা থেকে মুক্তি ও খুঁজে পেয়েছো।”

#### উপদেশ বাণী-১৪

শায়খ ইবরাহীম (সম্মতঃ মওলানা রূমীর খানেগাহ’তে অবস্থানরত কোনো দরবেশ) বলেন: “(শায়খ) সাইফুদ্দীন ফারাক যখন-ই কাউকে (শান্তিস্বরূপ) প্রহারের নির্দেশ দিতেন, তৎক্ষণাত তিনি (শায়খ) নিজেকে ব্যস্ত করে নিতেন, যতোক্ষণ না ওই শান্তি শেষ হতো; এটি এ কারণে করা হতো যাতে কেউ এসে সুপারিশ করতে না পারে।”

মওলানা রূমী (রহ.) বলেন: আপনারা এই দুনিয়ায় যা কিছু প্রত্যক্ষ করছেন, এর সবই হ্রবহ পরবর্তী জগতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এসব বাস্তবতা অপর (জগতের) বাস্তবতারই নমুনা মাত্র। এ জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল, তার সবই ওখান থেকে এসেছে।

বা’আলাবাক (লেবানন)-এর টেকো লোকটি তার মাথায় ট্রে’র মধ্যে বিভিন্ন ভেষজের নমুনা বহন করতো এক চিমটি গোলমরিচ, এক চিমটি আঠা, প্রত্যেকটি স্তুপ থেকেই একটি করে চিমটি। স্তুপের সংখ্যা অশেষ হলেও তার ট্রে’তে এর বেশি কিছু রাখার জায়গা কিন্তু থাকতো না। (দুনিয়ার) মানুষেরা হলো বা’আলাবাক শহরের ওই টেকো লোকটির মতো; তারা ভার বহন করে চলেছে খোদাতা’লার জ্ঞান ও ধনভাণ্ডারের একেক চিমটি ও টুকরো পরিমাণ, কিছু জ্ঞাত ও কিছু গোপন, যেমন নাকি এক টুকরো শ্রবণশক্তি, এক টুকরো বাকশক্তি, এক টুকরো যুক্তি/সুবিবেচনা, এক টুকরো উদারতা, এক টুকরো জ্ঞান ইত্যাদি। এ কারণে আমাদের কাজ-কর্ম সবসময় আল্লাহতা’লারই প্রতিফলন ঘটায়। এমন কয়েকজন সত্ত্ব আছেন যাঁরা আল্লাহতা’লার ‘হকার’। রাত-দিন তাঁরা ট্রে ভরে দেন। দিনে আপনারা জীবিকার প্রয়োজনে আপনাদের

অংশ খরচ করে ফেলেন, আর রাতে এসকল সত্তা আপনাদের ট্রে আবার ভরে দেন। উদাহরণস্বরূপ, অপর (অর্থাৎ, পরবর্তী) জগতে বিভিন্ন ধরনের দর্শন ও দিব্যদৃষ্টি বিদ্যমান। ওগুলোর কিছু নমুনা আপনাদের দেখার জন্যে এ জগতে পাঠানো হয়েছে। দর্শনক্ষমতা কেবল এ জগতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু মানবদেহ এর চেয়ে বেশি ধারণ করতে অক্ষম।

প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে সহস্র সহস্র মানুষ এসেছেন এবং ওই মহাসাগর (মানে খোদাতালা) হতে নিজেদের (পাত্র) পূর্ণ করেছেন, আর পুনঃপুনঃ ফিরেছেন (তাঁর কাছে)। ওই উৎস অশেষ, অসীম। ওই অসীম দরিয়ার কাছে যতো বেশিক্ষণ আমরা অবস্থান করি, ততোই আমাদের অন্তর হতে এই নমুনার জগতের প্রতি মায়া উবে যায়। এই দুনিয়া ওই টাকশাল (অর্থাৎ, খোদাতালা) হতে তৈরিকৃত মুদ্রা এবং তাকে অবশ্যই ওই টাকশালে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সমস্ত অংশ-ই ওই টাকশাল থেকে নিঃস্ত, ওই টাকশালেরই নমুনা সমগ্র, আর তাতেই ফিরে যেতে হবে; এই বিধান ছোট হোক, বড় হোক, সকল প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবু এই জগতের ট্রে'র ওপরে জীবন দৃশ্যমান হয়; ট্রে ব্যতিরেকে তা দৃশ্যমান হয় না।

ওই অনন্ত, অসীম জগত একটি সূক্ষ্ম আলম (জগত), আর তা নিজেকে সরাসরি প্রকাশ করে না। তথাপি দেখুন তা কী সুন্দরভাবে নিজের চেহারাকে এ দুনিয়ায় তুলে ধরে! আপনারা কি দেখেন না বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস কীভাবে গাছ-গাছালিতে ও ঘাসে, গোলাপ বাগানে ও মিষ্টস্বাদের নানা উষ্ণিদে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়? ক্ষেতের শস্য ও ফুলের আনন্দলিত হওয়ার মাধ্যমে আপনারা বসন্তকে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু আপনারা যখন খোদ ওই বাতাসের দিকে লক্ষ্য করেন, তখন কিছুই দেখতে পান না। এটি এ কারণে নয় যে ওই গোলাপ-বাগানের সৌন্দর্য মৃদুমন্দ বাতাসের বাস্তবতার বাইরে অবস্থিত। কেননা, বসন্তের মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহের মধ্যে অস্তর্ভুক্ত রয়েছে দোলায়মান গোলাপ-বাগান ও মিষ্টস্বাদের উষ্ণিদের প্রতিচ্ছবি; তবে ওইসব প্রতিচ্ছবি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। শুধু কিছু মাধ্যম দ্বারাই ওগুলোর সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায়।

অনুরূপভাবে, মানবসত্ত্বাও এসব গুণ/বৈশিষ্ট্য গোপন রয়েছে, আর কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক মাধ্যম দ্বারাই এগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে; কারো জন্যে বাচনিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা, কারো জন্যে কাজের মাধ্যমে, আবার কারো জন্যে যুদ্ধ অথবা শান্তিকালীন সময় দ্বারা। আপনারা এসব গুণকে নিজেদের মধ্যে দেখতে পান না। তাকিয়ে দেখুন, কিছুই খুঁজে পাবেন

না। এমতাবস্থায় আপনারা নিজেদেরকে এসব বৈশিষ্ট্যশূন্য বলে বিশ্বাস করেন। এসব গুণ সরাসরি এসে আপনারা যা ছিলেন তা হতে আপনাদেরকে অন্য কোনো কিছুতে পরিবর্তিত করে না। বরঞ্চ এগুলো আপনাদের মাঝেই লুকোনো রয়েছে, যেমনটি সাগরে নিহিত জলরাশি।

পানি সমুদ্রকে ছেড়ে যেতে পারে না, কেবল সূর্যতাপে মেঘমালায় পরিবর্তিত হয়েই তা পারে। এটি ঢেউয়ের আকৃতিতে ছাড়া দৃশ্যমান হতে পারে না। আপনাদের উর্মি হচ্ছে আপনাদেরই মধ্যে দৃশ্যমান এক উত্তালতা, কিন্তু যতোক্ষণ সাগর শান্ত ও স্থির থাকে, ততোক্ষণ আপনারা কিছুই দেখতে পান না। আপনাদের শরীর সাগরসৈকতে অবস্থিত, আর রুহ (আত্মা) খোদ ওই মহাসাগরেরই অংশ। আপনারা কি দেখেন না কতো মাছ, সাপ, পাখি ও জীবজন্ম বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রদর্শন করে, আবার ওই সমুদ্রেই ফিরে যায়? আপনাদের বৈশিষ্ট্য ধৈর্য, বন্ধুত্ব, আনুগত্য ও বাকি সবগুলো এই সাগর হতেই প্রবাহিত।

এ সকল বৈশিষ্ট্য খোদাতালার সূক্ষ্ম প্রেমিক। আপনারা কেবল জিহ্বার মাধ্যমে ওগুলোর ভেতর উঁকি দিতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ওগুলোর সূক্ষ্মতার কারণে বচন ব্যতিরেকে ওগুলো উন্মুক্ত, আর তাই ওগুলো দৃষ্টির আড়ালে খোদার কাছে ফিরে যায়।

### উপদেশ বাণী-১৫

মানুষের অভ্যন্তরে বিরাজ করে এক আকুল আকাঙ্ক্ষা ও কামনা, যার দরুণ এমন কি তারা যদি লক্ষ জগতেরও মালিক হতো, তথাপি তারা কোনো শান্তি বা স্বত্তি খুঁজে পেতো না। তারা প্রতিটি পেশা ও শিল্প-কৌশল শিক্ষা করে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ডাঙ্কারিশাস্ত্র এবং অন্য সব বিদ্যাও শিক্ষা করে, কিন্তু তারা পূর্ণতা খুঁজে পায় না। কেননা, তারা তাদের আসল কামনার খোঁজ পায়নি। (মরমী) কবিবৃন্দ প্রেমাস্পদ (খোদাতালা)-কে আখ্যা দেন “অন্তরের শান্তি” বলে, কেননা তাঁর মাঝেই অন্তর শান্তি খুঁজে পায়। প্রেমাস্পদ (খোদাতালা) ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে আমরা কীভাবে শান্তি ও স্বত্তি খুঁজে পেতে পারি? এসব (দুনিয়াবী) আনন্দ-ফুর্তি ও সাধের অন্বেষণ হচ্ছে একটি সোপানের মতো। মইয়ের ধাপগুলো কারো বাড়ি-ঘর বানাবার স্থান নয়, বরঞ্চ সেগুলো হচ্ছে অতিক্রম করার ধাপ। সৌভাগ্যবান সেসব ব্যক্তি, যাঁরা এটি উপলব্ধি করেছেন। ফলে এই দীর্ঘ রাস্তা তাঁদের জন্যে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর তাঁরাও ধাপগুলোতে নিজেদের জীবনকে বরবাদ করেন না।

কেউ একজন বলেন: “মংগল জাতি জোরপূর্বক জমি-সম্পত্তি

কেড়ে নিয়েছে, আর সময়ে সময়ে তারা এই সম্পত্তি আমাদেরকে ফেরতও দিচ্ছে। এটি এক অচূত পরিস্থিতি। এই সম্পত্তি গ্রহণ করা কি বৈধ হবে? এ ব্যাপারে আপনার রায় কী?"

মওলানা রূমী (রহ.) উভর দেন: মংগল জাতি যা কিছু জবরদখল করেছে এবং ফেরত দিচ্ছে, তার সবই খোদাতা'লার কজায় ও ভাঙারে ফিরে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনারা নদী হতে কোনো পাত্রে বা কলসে জল ভরে নিয়ে এলে তা আপনাদেরই সম্পত্তিতে পরিণত হয়। যতোক্ষণ ওই জল পাত্রটি বা কলসটিতে থাকে, ততোক্ষণ কারোরই নাক গলাবার কোনো অধিকার থাকে না। বিনা অনুমতিতে যে কেউ ওই পাত্রটি নিলে সে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু একবার সে ওই পানি নদীতে ফেরত দিলে তার মালিকানা শেষ হয়ে যায় এবং যে কারো জন্যে তা আবার নেয়া বৈধ হয়। অতএব, আমাদের সম্পত্তি তাদের কেড়ে নেয়া অবৈধ, অপরদিকে তাদের (ফেরত দেয়া) সম্পত্তি আমাদের জন্যে বৈধ; কেননা তারা তা ফেরত দিয়ে আল্লাহত্তালার ধনভাঙ্গারেই ফেরত দিয়েছে।

কেউ একজন বলেন: "মংগল সম্প্রদায় প্রথম যখন এতদৃশ্যলে আসে, তখন তারা ছিল বিবন্দ ও কপর্দকশূন্য। তারা মোষের পিঠে চড়তো এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল কাঠের তৈরি। কিন্তু এখন তারা কেতাদুরস্ত এবং ভালো খেয়ে হষ্টপুষ্ট, আর তাদের রয়েছে চমৎকার আরবীয় ঘোড়া ও মারণাস্ত্র।"

মওলানা রূমী (রহ.) উভর দেন: মংগল জাতি যখন মরিয়া ও দুর্বল ছিল, শক্তি ছিল না, তখন আল্লাহত্তালা তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের প্রার্থনার জবাব দেন। এখন যখন তারা শক্তিশালী ও পরাক্রমের অধিকারী, তখন আল্লাহ পাক দুর্বলের আরাম-আয়েশ দ্বারা তাদের বিনাশ সাধন করছেন, যাতে তারা উপলক্ষ্মি করতে পারে যে তাদের এই বিশ্বজয় একমাত্র খোদাতা'লার আশীর্বাদ ও সাহায্যেই সম্ভবপর হয়েছিল, আর তা তাদের আপন শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা অর্জিত হয়নি।

মংগল সম্প্রদায় মানব সভ্যতা থেকে দূরে জঙ্গলে বাস করতো, সহায়-সম্বলহীন, গরিব, বিবন্দ ও অভাবী অবস্থায়। দৈবক্রমে তাদের কেউ কেউ খাওয়ারিজম শাহের রাজ্য বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তারা কেনাবেচা আরম্ভ করে, আর নিজেদের শরীর আবৃত করার জন্যে মসলিন কিনতে থাকে। খাওয়ারিজম শাহ এতে বাদ সাধন, তাদেরকে হত্যার আদেশ দেন এবং বাকি সবার ওপর

করারোপ করেন। মংগলরা বিনয়ের সাথে তাদের নিজেদের রাজার কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করে এই বলে, "তারা আমাদের লোকদের হত্যা করেছে।" এমতাবস্থায় তাদের রাজা দশদিন সময় চেয়ে নেন, এবং এরপর তিনি এক গভীর গুহায় প্রবেশ করে উপবাস করেন, আর খোদার প্রতি সমর্পিত হন। দশম দিবসে খোদাতা'লার কাছ থেকে এ মর্মে একটি ফরমান জারি হয়, "আমি তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছি। অগ্রসর হও! যেখানে যাবে, তুমি-ই বিজয়ী হবে!" আর (ঐশ্বী ইচ্ছায়) তাই ঘটেছে। তারা যখন অগ্রসর হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় তারাই বিজয়ী হতে থাকে এবং দুনিয়া তাদের কজায় চলে আসে। কেউ একজন বলেন: "মংগল সম্প্রদায়ও আখেরাতে (পুনরুত্থানে) বিশ্বাস করে এবং স্বীকার করে যে শেষ বিচার বলে কিছু একটা আছে।"

মওলানা রূমী (রহ.) উভর দেন: তারা মিথ্যেবাদী; মুসলমান সমাজ যাতে তাদেরকে গ্রহণ করেন, এ কামনায় তারা এই মিথ্যে বলছে। তারা যদি সত্য পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো, তাহলে এর সপক্ষে প্রমাণ কোথায়? তাদের দ্বারা সংঘটিত পাপ, অন্যায় ও মন্দ হচ্ছে পর্বত-সমান উচ্চতাবিশিষ্ট বরফ ও তুষারের জমা হওয়া স্তুপ। পুনরুত্থানের চিন্তা আমাদের মাথায় এলে তা সূর্যের মতোই পাপের ওই তুষারগুলোকে গলিয়ে ফেলে, যেমনটি আসমানের সূর্য সমস্ত শক্ত বস্তুকেই গলিয়ে ফেলে। অতএব, গ্রীষ্ম এলে তা কীভাবে শীত ও তুষারকে বহাল তৰিয়তে ছেড়ে দিতে পারে? মংগলদের (পাপের) বরফস্তুপ-ই প্রমাণ বহন করে যে তাদের ওপর সূর্য এখনো কিরণ ছড়ায়নি।

খোদাতা'লা যদিও শেষ বিচার দিনে সকল উত্তম ও মন্দ কর্মের প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, তবুও প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি ক্ষণে এর একটি নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে। কারো অন্তরে সুখ দেখা দিলে অন্য কাউকে সুখি করার পুরক্ষারস্বরূপ-ই সে তা পেয়েছে। আর তারা দুঃখি হলে অন্য কাউকে দুঃখ দেয়ারই পরিণতি সেটি। এগুলো পরকালীন জগতের উপহার এবং ওই পুরক্ষার-দিবসেরই একেক নির্দশন, যাতে এসব ছোটখাটো জিনিস থেকে আমরা ওই সব বড় বিষয়গুলো উপলক্ষ্মি করতে পারি, ঠিক যেমনটি গোটা শস্যের স্তুপ হতে দানকৃত এক মুঠো শস্য।

মহানবী (দ.) তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক রাতে আপন (মোবারক) হাতে ব্যথা অনুভব করেন। তাঁর কাছে (ঐশ্বী প্রত্যাদেশ মারফত) জানানো হয় যে, এই ব্যথা (সাহাবী) হ্যরত আব্বাস (রাঃ)-এর হাতে ব্যথা দেয়ার ফলশ্রুতিতেই হয়েছে। কেননা, তিনি হ্যরত আব্বাস (রাঃ)-কে বন্দী

## শিশু-কিশোর মাহফিল

### কোরআন-হাদিসের গল্প, ছেটদের কোরআন-অভিধান

#### চতুর্থ দিন:

তারা দু' ভাই বোন একত্রে বসে বই পড়ছিল। তাদের পড়াশেষ হলে মা আমিনা কিছু ফলের রস নিয়ে পাঠকক্ষে চুকলেন। তারা প্রার্থনা নিয়ে আলাপ করল। আমিনা বললেন, ‘বাছারা শোনো, যে কোনো স্থানে যে কোনো সময়ে দু’আ করা যায়। কিন্তু’ কিছু বিশেষ দিন ও ক্ষণ আছে যখন দু’আ করুল হয়।’

“চমৎকার! কিন্তু’ ঐ সকল সময়ে দু’আ করুল হয়, এ কথা কে বলেছেন?”

আমিনা জবাব দিলেন, “এ কথা বলেছেন, আমাদের মহান নবী হ্যরত রাসূলে করিম সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।” “তাহলে দু’আ করুল কৰার সময় কোনটি?” জানতে চাইল সামিনা।

হ্যরত রাসূলে করিম সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কুরআন মজিদ খতম করার পর, বৃষ্টি হওয়ার সময়, প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে, সকালে, রম্যান মাসে, কা’বা শরিফ দেখার পর, সিজদার সময় দু’আ করুল হয়।”

ডা. ওমর বললেন, “লায়লাতুল কুদরের দু’আ, জুমাবারের আগের ও পরের রাতের দু’আ, রম্যানের রাতসমূহের দু’আ এবং কুরবানির সময়ের দু’আ করুল হয়।”

**দু’আ:** যখন তোমরা প্রার্থনা শেষ করো তখন আল্লাহকে দাঁড়িয়ে, বসে অথবা কাত হয়ে শুয়ে শ্মরণ করো। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে। নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু’মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য- (সূরা নিসা, ৪:১০৩)।

#### পঞ্চম দিন:

দু’আর গুরুত্ব কী তা ছেলেমেয়েরা আরো ভালোভাবে বুঝতে শিখেছে। নিজের সকল ইচ্ছা ও সমস্যার কথা একমাত্র আল্লাহর কাছে পেশ করার নাম দু’আ বা প্রার্থনা। যারা দু’আ করে তাদের জন্য আল্লাহর ভালবাসা বেড়ে যায়। সামিনা আর বিলাল এখন আগের চেয়ে বেশি খুশী। তাদের জীবনে শান্তি, স্বচ্ছতা অনেক বেড়ে গেছে। কারণ তারা এখন নিয়মিত প্রার্থনা করে। তারা এখন বুঝতে শিখেছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। আমাদের জীবনে যত অনুগ্রহ আমরা

লাভ করি, যত নিয়ামত ভোগ করি সবকিছু আসে আল্লাহর তরফ হতে। যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নেই সে বাতাসও তাঁর দান। এক কথায় পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সবই তাঁর। যখন আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তখন তিনি আমাদের আরো বেশি করে ভালবাসেন।

তাদের পরিবারের সবার মনে এখন শান্তি ও স্বচ্ছতা বিরাজ করছে। কারণ তারা প্রতিদিনই নিয়মিত প্রার্থনা করে চলছে। প্রয়োজনীয় সকল কিছু মালিকের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া ও প্রত্যাশা করার মত সুন্দর কর্ম আর কী হতে পারে! আল্লাহর কাছে আজকের প্রার্থনাটি বিলাল নিজে করেছে, কারণ তার মা-বাবাই তাকে এসকল বিষয় শিখিয়েছেন: ‘হে আল্লাহ! আমি যা কিছু দেখি ও দেখিনা সবকিছু তোমারই সৃষ্টি। তুমই একমাত্র সৃষ্টি, যিনি আমার প্রার্থনা শোনেন এবং আমার ডাকে সাড়া দেন। যখন প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা তোমাকে খুঁজি তখন তুমি আমাদের ভালবাস। আমাদের মা বাবাকেও ভালবাসা দাও, যাঁরা আমাদেরকে প্রার্থনা করাকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। আমীন!

**দু’আ:** রাববানাগ ফিরলি ওয়াল ওয়ালেদাইয়া ওয়াল মু’মিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিছাব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার মা-বাবাকে ক্ষমা কর, এবং ক্ষমা কর সকল মু’মিনকে। যেদিন তুমি শেষ বিচারের দিন সকলকে একত্রিত করবে- (সূরা ইবরাহিম ১৪:৪১)।

#### ষষ্ঠি দিন:

#### দু’আর বিনিয়য়

সকালে নাস্তার টেবিলে বিলাল তার রাতের স্বপ্নের কথা সবাইকে জানাল। সে স্বপ্নে দেখেছে তার দাদা তার জন্য দু’আ করছেন আর তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সে তার বাবাকে বলল, “স্বপ্নটিকে আমার একেবারে বাস্তব মনে হয়েছে। আমি সকালে ঘুম থেকে ওঠে দাদার প্রার্থনার কথাটি অনুভব করেছি। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি এ প্রার্থনাটি পূরণ হবে কিনা।” বাবা বললেন, “অন্যের জন্য প্রার্থনা করলে তা করুল হয়। আবার কিছু মানুষ আছে যাদের প্রার্থনা সাথে সাথে করুল হয়।”

বিলাল বেশ উৎফুল্ল হল। সে জানতে চাইল, “কারা সেসব লোক?”

“সন্তানের জন্য মা-বাবার দু’আ, ভাইবোনের পরম্পরের জন্য দু’আ, আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির দু’আ, শিক্ষকের দু’আ, মেহমানের দু’আ, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দু’আ, কুরআনে হাফিয়ের দু’আ, মুসাফিরের দু’আ, বয়স্ক ব্যক্তির দু’আ এবং মজলুমের দু’আ তাড়াতাড়ি করুল হয়।”

বিলাল বলল, “বাবা, আমাদের উচিত এ সকল লোকের কাছ থেকে বেশি বেশি দু’আ কামনা করা। তাই নয় কি?”  
এ প্রশ্নের জবাব দিলেন ঈমান। “হাঁ বাবা, তুমি যদি তাদের জন্য দু’আ করো তাহলে তারাও তোমার জন্য দু’আ করবেন।”

দু’আ: হে আল্লাহ! আমাদের সকল দু’আ করুল করো।  
আমরা যাঁদের জন্য দু’আ করি তাঁরাও যেন দু’আ করার সময় আমাদের কথা স্মরণ করেন। একে অন্যের সাথে আমাদের দু’আর যেন বিনিময় ঘটে। আমীন!

#### সম্মত দিন:

বিলালের শিক্ষক হাসান সাহেব ক্লাশ নিচ্ছেন। তিনি কিছুটা বিমর্শ। তাঁর সহকর্মী আলী সাহেব শিক্ষকতার কাজে এক দূরবর্তী স্কুলে চলে যাবেন। প্রিয় বন্ধুর সাথে তাঁর আর দেখা হবে না। তিনি তাঁর ছাত্রদের কথাটি জানাতে চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, “প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা! আমি তোমাদের একটা কথা জানাতে চাই। ব্রেকটাইম পর্যন্ত আমাদের আলাপ চলবে। আমার সেরা বন্ধু আলী সাহেব আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি দেশের পূর্বাঞ্চলের এক স্কুলে যোগ দেবেন। এমন একজন ভালো বন্ধুর সাথে বিচ্ছেদ ঘটায় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমার বন্ধু ইস্তামুলকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু ‘তিনি বললেন, ‘আশা করি সব কিছু ঠিকঠাক চলবে’ বলে তিনি চলে গেছেন। সেখানে নৃতন ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিলিত হবার জন্য তিনি উদ্বৃত্তি। আমি তাঁর জন্য দু’আ করছি।”  
বিলাল খুব মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা শুনেছে। বাড়ি ফিরে সে কথাটি সবাইকে জানাল।

দু’আ: হে আল্লাহ! তুমি চাইলে অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হতে পারে। আর তুমি যদি না চাও তাহলে সহজ সম্ভাব্য বিষয়ও অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। যদিও আমরা কোনো বিষয়ে মন খারাপ করি তুমি চাইলে তাতে কল্যাণও নিহিত থাকতে পারে। আমরা সে কল্যাণের সাথে থাকতে চাই। আমীন!

#### অষ্টম দিন:

##### ছোট মনির ছোট হৃদয়

রাতের খাবারের পর সামিনা তার বাবাকে বলল, “আল্লাহ কি প্রার্থনা করার জন্য আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন? আমরা আল্লাহর কাছে কোনকিছু চাইলে তিনি তা আমাদের দেন। আমি যতই প্রার্থনা করি ততই আল্লাহর প্রতি আমার ভালবাসা বেড়ে যায়।”

সামিনার কথায় বাবা বেশ খুশি হলেন।

তিনি বললেন, “মা মনি! আল্লাহ আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাঁকে জানার জন্য এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার জন্য। কুরআন পড়া ও তা মানা এবং ভালোভাবে হাদিস শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা শুরু হয়। দু’আ করাও এক প্রকার প্রার্থনা। আল্লাহ, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি বলেছেন: “আমি তোমাদের অতি নিকটে। আমার কোনো বান্দা যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাথে সাথে সাড়া দেই।”

সামিনা এখন বুঝতে পারল প্রার্থনা করা মানে শুধু নামায পড়া ও রোজা রাখা নয়।

দু’আ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমার মনে যেসব কথা উদয় হয় এবং যা আমি প্রার্থনা হিসেবে উচ্চারণ করি সবকিছু তোমারই সৃষ্টি। আমার হৃদয়ে তুমি তোমার অনন্ত ভালবাসা ঢেলে দাও। আমীন!

## দৃষ্টি আকর্ষণ

মাসিক আলোকধারা’র সম্মানিত পাঠকগণ  
এখন থেকে ‘পাঠক পর্যবেক্ষণ’ কলামে  
আপনাদের সুচিত্তি মতামত পাঠাতে  
পারবেন। এতে সমকালীন জাতীয় ও  
আন্তর্জাতিক মানবিক-সামাজিক সমস্যা ও  
যৌক্তিক সমাধানপূর্ণ মতামতকে স্বাগত  
জানানো হবে। লেখা সম্পাদকীয় দণ্ডে

e-mail:  
sufialokdhara@gmail.com -এ  
পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

## শিশু-কিশোর মাহফিল

# আল্লাহতায়ালার বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ‘ফেরেশ্তা’ একটি

সোনালী বন্ধুরা, মহান আল্লাহতায়ালার বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ‘ফেরেশ্তা’ একটি। আল্লাহতায়ালার এই সৃষ্টির উপর বিশ্বাস করা হচ্ছে, আমরা যাকে ঈমান বা বিশ্বাস বলি তারই ষষ্ঠতম স্তুতি। মুসলমান হিসেবে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ঘিরে অনেক ফেরেশ্তা অবস্থান করে থাকেন।

### তোমরা কী জান ফেরেশ্তা আসলে কী?

ফেরেশ্তা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ, জিন এবং ফেরেশ্তা অন্তর্ভুক্ত। আগেইতো বলেছি সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার সকল সৃষ্টিই সুন্দর ও বিস্ময়কর। তার মধ্যে রয়েছে এই ফেরেশ্তা। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরআন মজিদের মাধ্যমে আমাদের বলেছেন, ফেরেশ্তাগণ ‘নূর’ দিয়ে তৈরি।

### ‘নূর’ কাকে বলে তোমরা তা জানো কী?

‘নূর’ হচ্ছে পবিত্র আলো। মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় এই আলো থেকে ফেরেশ্তাগণকে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সাধারণ জীবনে আলোর উৎস যেমনি বিদ্যুৎ বা তড়িৎ, সূর্য, আগুন ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি নূর বা পবিত্র আলোর জগতেও নূরের নানাবিধি স্তর রয়েছে। এগুলো তোমরা বড় হয়ে যখন অধ্যয়ন-গবেষণা করবে তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে।

### ফেরেশ্তাগণ দেখতে কেমন জানো কী?

বিভিন্ন বই অথবা সাময়িকপত্রে আমরা অনেক সময় ফেরেশ্তাগণের ছবি দেখতে পাই। সেগুলো শিল্পীদের হাতে আঁকা। কিন্তু এসব ছবি সত্যিকার ফেরেশ্তাদের ছবি নয়। কেউই আসলে জানে না, আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশ্তা সত্যি সত্যি দেখতে কেমন হয়। বই, পত্রপত্রিকায় আমরা ফেরেশ্তাদের যে সব ছবি দেখতে পাই, আসলে সেগুলো কারো বা কোনো শিল্পীর কল্পনা থেকে আঁকা ছবি।

### ফেরেশ্তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণনা আছে কী?

হ্যাঁ, পবিত্র কোরআন মজিদে ফেরেশ্তাদের অবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র কোরআন মজিদ আমাদের জানাচ্ছে,

ফেরেশ্তাগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও অবয়ব ধারণ করতে পারেন। কোরআন মজিদের বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশ্তাগণের পাখা রয়েছে। কারো দু'টি, কারো চারটি, কারো বা তারও চেয়ে বেশি। মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) বলেছেন, ফেরেশ্তা জিবরাইল (আ.) এর ৬০০ পাখা রয়েছে।

### ফেরেশ্তাগণের কোনো কাজ আছে কী?

হ্যাঁ, ফেরেশ্তাগণের অনেক কাজ রয়েছে। তারা মহান আল্লাহতায়ালার আদেশ-নির্দেশ পালন করে থাকেন। তারা তা করেন নির্দিষ্টায়, কোন অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়াই, একান্ত বাধ্যগতভাবে। সোনালী বন্ধুরা জেনে রাখো, ফেরেশ্তাদের কিন্তু ঘুমাতে যাওয়া কিংবা খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারা ক্লান্তও হন না। সব সময় তারা আল্লাহতায়ালার উপাসনা বা ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তারা কী ভাবে উপাসনা করবেন তার জন্য তাদের নির্দিষ্ট উপাসনা বা ইবাদতের পদ্ধতি রয়েছে। তারা কী ভাবে আল্লাহর নাম জপ করবেন বা পবিত্র আল্লাহর নামে জিকির করবেন তার জন্যও তাদের নির্দিষ্ট তাসবিহ বা জপ-পদ্ধতি রয়েছে। তারা এভাবেই সব সময় ইবাদত করে যাবেন, যতদিন না সৃষ্টি জগতের সময় ফুরিয়ে আসে।

### অভিভাবক ফেরেশ্তা কাকে বলে জানো?

আমরা যারা মানুষ বা ইনসান, আমাদেরকে আল্লাহতায়ালা খুব ভালবাসেন। আমাদের প্রত্যেকের সুরক্ষায় তাই মহান আল্লাহ দু'জন করে ফেরেশ্তা নিয়োজিত রেখেছেন। তাদের একজন মানুষের সামনে, অপরজন পেছনে অবস্থান করেন। তারা আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে দেখাশোনা করেন এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। আর সেজন্য এ দু'জন ফেরেশ্তাকে অভিভাবক ফেরেশ্তা বলা হয়ে থাকে।

### মানুষের সাথে আর কোনো ফেরেশ্তা থাকে?

হ্যাঁ, সোনালী বন্ধুরা, দুই অভিভাবক ফেরেশ্তা ছাড়াও আরো দু'জন ফেরেশ্তা প্রতিটি মানুষের বাম এবং ডান এই দুই দিকে অবস্থান করেন। তারা আমাদের ভালমন্দ কাজের রেকর্ড প্রতি মুহূর্তে লিপিবদ্ধ করেন। তাদেরকে বলা হয়,

‘সম্মানিত লেখক ফেরেশ্তা’ বা কিরামন কাতেবীন। ডান কাঁধ বরাবর ফেরেশ্তা আমাদের ভাল কাজগুলো এবং বাম কাঁধ বরাবর ফেরেশ্তা আমাদের খারাপ কাজগুলো লিখে রাখেন।

### আচ্ছা, তাহলে ফেরেশ্তাদের নেতা কে?

ফেরেশ্তাগণের নেতা হচ্ছেন জিবরাইল (আ.)। এই ফেরেশ্তার রয়েছে ৬০০ পাখা। তিনিই সেই ফেরেশ্তা যিনি পৃথিবীর সকল নবীগণের কাছে আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা, যাকে অনেকে বলেন মহান আল্লাহতায়ালার পবিত্র কালাম সেসব নিয়ে এসেছেন, এবং যথাযথভাবে তা পৌছে দিয়েছেন।

### আমরা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ফেরেশ্তা

#### সম্পর্কে জানতে পারি?

হ্যাঁ, অবশ্যই কেনো নয়? প্রথমেই বলি হ্যরত জিবরাইল (আ.), আল্লাহতায়ালার নির্দেশে তিনি আল্লাহর গ্রন্থ, বাণী, বার্তা নবীগণের কাছে পৌছে দিয়েছেন।

হ্যরত মিকাইল (আ.), ইনি আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত তত্ত্বাবধান করেন।

হ্যরত ইসরাফিল (আ.), ইনি একটি, বাঁশি, বিউগল বা শব্দ নিঃসৃত হয় এরকম একটি যন্ত্র হাতে অপেক্ষমান। আল্লাহতায়ালার নির্দেশে তিনি যখন এটি বাজাবেন তখন কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে।

হ্যরত রিদওয়ান (আ.), ইনি আল্লাহর নির্দেশে জান্নাত বা বেহেশ্ত যাকে বলি তাঁর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

হ্যরত মালিক (আ.), ইনি আল্লাহর নির্দেশে দোষখ বা নরকের এবং সেখানে বিরাজমান কঠিন আগুনের শিখার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

হ্যরত আজরাইল (আ.), ইনি আল্লাহর নির্দেশে মানুষের আত্মাকে নিয়ে নেন। তাতেই মানুষের জীবনাবসান হয়। আত্মাকে আরবিতে বলে রহ।

এছাড়াও আরো অনেক ফেরেশ্তা আছেন যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করছেন।

### ফেরেশ্তারা কোথায় ইবাদত করেন জানো কী?

আল্লাহর বেহেশ্ত এলাকায় আমাদের পবিত্র কুবা শরিফের অনুরূপ একটি মসজিদ আছে। তাকে বলা হয় ‘আল বায়তুল মামুর’। সেখানে ফেরেশ্তারা ইবাদত বন্দেগি করে থাকেন। প্রতিদিন ৭০ হাজার নতুন ফেরেশ্তা এই মসজিদে হজ্ব পালন করেন।

## সুফি উদ্ধৃতি

- আল্লাহর জমিনে ভ্রমণ কর। কেননা, পানি যতদিন প্রবাহিত হতে থাকে পরিষ্কার থাকে। আবদ্ধ হয়ে পড়লে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং রংও পরিবর্তন হয়ে যায়।
- সন্দেহজনক বিষয় ও কাজ হতে নিজেকে পরিষ্কার রাখা এবং প্রতি মুছ্রতে নিজের কাজের হিসাব রাখাই প্রকৃত পরহেজগারী।
- আ’রিফ অর্থাৎ আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানীরাই আল্লাহতায়ালার খাস বা বিশিষ্ট লোক। আর সুফি সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহতায়ালার ব্যাপারে মন পরিষ্কার রাখেন।
- তিনিই প্রকৃত আ’রিফ বা আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানী যাকে আল্লাহতায়ালা ভিন্ন অন্যকেউ চিনে না। আর আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কেউ তাঁকে সম্মান করে না।
- যে ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে আল্লাহর ওয়াস্তে আমল করে, তাঁর হস্তয়ে লোক সমাজের প্রতি বিত্তৰ্ণা ও ঘৃণার উৎপত্তি হয়।
- তুমি ততক্ষণ কামেল হতে পারবে না, যতক্ষণ তোমার শক্তি তোমার থেকে নির্ভর ও নিরাপদ না হয়।
- কথা বললে যদি তোমার কথার মধ্যে অহংকার ও গর্বের ভাব প্রকাশ পায়, তবে বলিও না, নিরব থাক। আর যদি নিরব থাকার মধ্যে কিছু আত্মর্যাদা বোধের খেয়াল হয়, তবে কথা বল। মোটকথা এমন কাজ কর যাতে আহংকার ও আত্মর্যাদাবোধ উভয়েই দূরীভূত হয়।

-হ্যরত বিশর ইবন হারেস হাফী (রহ.)

জীবনালেখ্য

# সুফি কাব্যের কালজয়ী কবি নূরুদ্দিন আবদুর রহমান জামি (র.)

অনুবাদ ও পুনর্ভাষ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

মূলতঃ অধ্যাত্মাবাদ ও সুফিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত ধ্যান থেকে উঠে আসা ঐশ্বর্যময় সুফিকাব্যের কালজয়ী কবি তিনি। তাঁর নাম নূরুদ্দিন আবদুর রহমান জামি। মুসলিম অধ্যাত্মাবাদী এই মনীষী পারস্যের সুফি সাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে শ্রদ্ধেয়। সুফি কাব্যের কবি হিসেবে খ্যাতির পাশাপাশি মাওলানা জামি আরো যেসব গুণাবলীতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়েছেন, সেগুলো হচ্ছে: তিনি ছিলেন অধ্যাত্মাধৰ্মীক, আধ্যাত্মিক কবি বা আলোকিত আত্মার কাব্যকার, ইতিহাসবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর এই বহুমুখী জ্ঞানরশ্মির উৎসবিন্দু ও প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে তাঁর আত্মার সুফিবাদী বা অধ্যাত্মাবাদী গভীরতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। যেখানে মহান স্মৃষ্টির অসীম শক্তি ও সৌন্দর্যের অন্ধেষায় সৃষ্টির আত্মা প্রতিনিয়তঃ উদ্বেলিত, সেখানেই জ্ঞান-রশ্মিধারার বিচ্ছুরণ ঘটে। কবি জামি'র ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

তিনি স্থানভেদে, ভাষাগত উচ্চারণভেদে আরো কিছু নামেও পরিচিত ছিলেন। সেগুলো হচ্ছে, তাঁকে কখনো ডাকা হতো, নূর আল দ্বীন আবদ আল রাহমান, অথবা আবদ আল রাহমান নূর-আল-দ্বীন মুহাম্মদ দাস্তি। অথবা সহজ ভাষায় জামি। তুর্কিতে তাকে ডাকা হয় মোল্লা সামি।

জামি ফার্সি কবি হিসেবে জগদ্বিখ্যাত। তাঁর জন্ম ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দের (সৈসায়ী সনের) ৭ নভেম্বর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন খোরাসানের জাম নামক স্থানে, আধুনিক সময়ে যে স্থানটিকে বলা হয় আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশ। তিনি ইন্তিকাল করেন ৭৮ বছর বয়সে খোরাসানের হিরাত নামক স্থানে, আধুনিককালে যাকে বলা হয় আফগানিস্তানের হিরাত প্রদেশ। ইসলামী অধ্যাত্মাবাদী এই কবির মধ্যে পারস্যের বিখ্যাত সুফিবাদী কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমির (র.) প্রভাব রয়েছে বলেও অনেক গবেষক বলে থাকেন।

জামি তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃজনশীলতায় ও পাণ্ডিত্যে সুফি সাহিত্যের একজন অন্যতম লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তার মূল পরিচয় ছিলো অধিবিদ্যার জন্য প্রখ্যাত ইবন আরাবি এবং খাজেগানি সুফিবাদের আধ্যাত্মিক ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় বিষয়ের উপর অসাধারণ বিশ্লেষণী বাণিজ্য এবং কাব্য রচনার অপূর্ব ক্ষমতার জন্য।

জামি'র উল্লেখযোগ্য কাব্য সমূহ হচ্ছে, হাফত অওরঙ্গ,

তুহফাত আল-আহরার, লায়লা ওয়া মজনুন, ফাতিহাত আল-শাবাব, লাওয়াইহ, আল ডুররা আল-ফাকিরাহ। জামি'র পিতার নাম নিজাম আল দ্বীন আহমাদ বি.শামস আল-দ্বীন মুহাম্মদ, ইতোপূর্বে পারস্যের ইসফাহানের দাস্ত নামের ছোট শহর থেকে আফগানিস্তানের জাম বা ঘোর প্রদেশে চলে এসেছিলেন। জামি'র জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা সপরিবারে আফগানিস্তানের হিরাত প্রদেশে চলে যান। ফলে জামি'র জন্ম নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হলো। তিনি সেখানে যে সব বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ পান সেগুলো হলো: মনীষী এরিস্টটলের দার্শনিক তত্ত্ব, গণিত, পারস্য সাহিত্য বা ফার্সি সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আরবি ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র ও তর্কবিদ্যা, এবং ইসলামী দর্শন। সেখানকার নিজামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন। জামি'র পিতাও একজন সুফি ছিলেন। তাঁর পিতাই ছিলেন তাঁর প্রথম শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে জামি তৈমুরিয়া রাজ কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। এতে করে তিনি সে সময়কার রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এবং ধর্মীয় জীবনচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলো থেকে প্রভৃতি অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হন।

কবি জামি'র পিতা যেহেতু ইতোপূর্বে ইসফাহানের দাস্ত থেকে আফগানিস্তান এসেছিলেন, সে সুবাদে প্রথম দিকে তাঁর লেখক নাম (পেন নেইম) ছিলো দাস্তি। কিন্তু পরে তিনি তাঁর লেখক নাম জামি রাখাটাই স্থির করেন। তিনি লেখক হিসেবে জামি নামে কেনো অভিহিত হলেন তার দু'টি কারণ তিনি তার কবিতাতেও বিধৃত করেছেন।

তাঁর কবিতাটি হলো:

'আমার জন্মভূমি হলো জাম,  
কিন্তু আমার কলম শেখ-উল-ইসলাম (আহমাদ)  
জাম এর জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়েছে অবিরাম।  
আমার কাব্যগ্রন্থগুলো যে নামটি করেছে ধারণ,  
তার পেছনে প্রচন্ড এ দু'টি কারণ।'- জামি

জামি সেসময় তুরস্কের বিখ্যাত কবি আলিশের নেভোয় এর শিক্ষক এবং বন্ধু উভয়টিই ছিলেন। একথা তিনি স্নেহ ও বন্ধু বাংসল্যে তাঁর একটি কবিতায় লিখে গেছেন।

কবিতাটি হচ্ছে:

‘ইউ কি ইয়াক তুর্ক বুদ ভা  
মান তাজিক,  
হারদু দোসতিম খেশিই  
নাজদিক।’- জামি

কবিতাটি বাংলা করলে দাঁড়ায়:

‘যদিও সে তুরস্কের এবং আমি  
তাজিকের লোক,  
কিন্তু নৈকট্যে আমরা বন্ধুপ্রতিম  
আমাদের এই পরিচয় হোক।’- জামি



নুরুল্লাদিন আবদুর রহমান জামি (র.)-এর এই প্রতিকৃতিটি  
ঠিকেছেন হিরাতের বিখ্যাত শিল্পী কামালুদ্দিন বিহুদ

সে সময় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মুসলিম বিশ্বে সুবিখ্যাত ছিলো  
সমরকন্দ। অতঃপর কবি মাওলানা জামি সেখানে গিয়ে তাঁর

বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পন্ন করেন। জামি এভাবে নানাস্থানে বিভিন্ন  
জ্ঞানতীর্থে জ্ঞান আহরণের জন্য অভিযান্ত্রী হয়েছিলেন বলেই  
তার জ্ঞানেশ্বর্য, প্রজ্ঞা, কাব্যপ্রতিভা, সুফিবাদের মরমি অন্তর্লান  
ধ্যান এবং আলোকিত চোখে সকল জ্ঞানের প্রতিভূ মহান  
স্মষ্টাকে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে অবলোকন করতে পেরেছিলেন। হয়ে  
উঠেছিলেন সমগ্র পারস্যের একজন জ্ঞানসমৃদ্ধ মহীরংহ  
মানবে।

জামির একজন ভাইও ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো মাওলানা  
মোহাম্মদ। তাঁর এই ভাইটি একজন সুশিক্ষিত মানুষ হিসেবে  
পরিচিত ছিলেন। সর্বোপরি মাওলানা মোহাম্মদ ছিলেন  
সুরবিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ। মাওলানা মোহাম্মদ ইত্তিকাল করলে জামি  
এতোই শোকার্ত হয়ে পড়েন যে ভাইকে নিয়ে একটি  
শোকবিধুর কবিতাও তিনি রচনা করেন।

কবি জামি চারপুত্র সন্তানের জনক হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর  
তিনি শিশুপুত্রাই এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে।  
যে শিশুপুত্রাটি বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিলো তিনি তাঁর নাম  
রাখেন যিয়া-উদ-দীন ইউসেফ। ‘বাহারেন্তান’ নামের যে  
কাব্যটি জামি লিখেছিলেন তার প্রেরণা এবং উপলক্ষ ছিলো  
বেঁচে থাকা স্নেহাধিক এই পুত্র সন্তানটিই।

জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে যুগশ্রেষ্ঠ ফার্সি সুফি কবি এবং  
জ্ঞানতাপস মাওলানা জামি হিরাতে বসবাস করেছিলেন।  
খোরাসানের হিরাতেই তিনি ইত্তিকাল করেন। স্বভাবতঃই  
কবি জামি’র মায়ারও সেখানে। অধ্যাতলেতন্ত্রে ঝদ্দ, পরিব্র  
সন্তা ও জ্ঞানালোকিত সুফি, দার্শনিক জামি’র মায়ারে স্থাপিত  
একটি স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ অসাধারণ একটি এপিটাফের কথা  
শোনা যায়।

ঐ এপিটাফের কাব্যময় কথাগুলো পাঠ করলে অশ্রু সংবরণ  
করা কঠিন। অনেক কবিই তাঁদের স্ব স্ব সমাধিস্তম্ভের বাণী বা  
এপিটাফ নিজেই রচনা করে যান। কিংবা মৃত্যুর পর কবির  
কোনো কবিতা থেকেই এপিটাফ উৎকীর্ণ হয়। ফার্সি থেকে  
ইংরেজিতে ঐ এপিটাফ যেখানে উদ্ধৃত হয়েছে, তার একটি  
বাংলা অনুবাদ বা ভাষাত্তর নীচে দেয়ার চেষ্টা করা হলো।  
যদিও মূল ভাষার ঘনিষ্ঠ সৌরভ ও অনুভূতি অনুবাদভাষ্যে  
পুরোপুরি নাও মিলতে পারে।

**জামির মায়ারের স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ এপিটাফ:**

‘আমার চোখের সামনে থেকে, তোমার মুখ যখন লুকায়,  
ঘন অঙ্ককার রাতে যেভাবে চাঁদ ঢেকে যায়।  
আকাশের দ্যুতিময় তারা-দের স্থলে

ঝরাই তারা'র কান্না ধরিত্বি আঁচলে ।  
এখনো আমার রাত্রি ঘোর অঙ্ককার,  
স্তুতায় কিছু নেই সব একাকার ।'

[WHEN YOUR FACE IS HIDDEN FROM ME,  
LIKE THE MOON HIDDEN ON A DARK NIGHT,  
I SHED STARS OF TEARS  
AND YET MY NIGHT REMAINS DARK,  
IN SPITE OF ALL THOSE SHINING STARS.]

কবি জামি'র মৃত্যুর তারিখ নিয়ে অবশ্য গবেষকদের মধ্যে মতান্তর-বিতর্ক রয়েছে। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে তারিখটি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের (সিসায়ী সনের) নভেম্বর মাসে। তবে তাঁর চলে যাওয়া ছিলো একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুসলমান ফার্সিভাষী কবির কবিতা এবং তাঁর অবদানকালের অবসান। সেই সাথে আরো স্মরণীয় যে এই তারিখটি থেকেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে ৭৮১ বছর পর স্পেনে আরবদের বসবাস ও বিচরণের অবসান ঘটে।

সে সময়ে হিরাতের প্রিস (একজন রাজপুরুষ) কবি জামি'র দাফনপূর্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর নামায়ে জানায়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষ, ভক্ত-অনুরাগীর সমাবেশ ঘটেছিলো বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। একজন বড় মাপের কবি, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সুফি সাধক ও অধ্যাত্মাদী মানুষ হিসেবে নুরুন্দিন আবদুর রহমান জামি আজও সারা বিশ্বে একুশ শতকের অগণিত ভক্ত-অনুরাগী পাঠকের কাছে সমানভাবে শ্রদ্ধেয়।

### শিল্পী কামালুন্দিন বিহ্যাদ (১৪৪০-১৫২৪)

সুফিকাব্যের কালজয়ী কবি, দার্শনিক আবদুর রহমান জামিকে নিয়ে (১৪১৪-১৪৯২) রচিত এই জীবনালেখ্যে সংযুক্ত প্রতিকৃতিটি এঁকেছিলেন হিরাতে মুসলিম চিত্রকলার স্বর্ণযুগের ক্ষণজন্ম প্রতিভাবানশিল্পী কামালুন্দিন বিহ্যাদ। সুলতান হুসাইন মির্জার রাজত্বকালে (১৪৬৮-১৫০৬) হিরাতে মুসলিম চিত্রকলার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর গ্রন্থ 'মুসলিম চিত্রকলা'য় লিখেছেন, শিল্পী বিহ্যাদ সুলতান হুসাইন মির্জার মন্ত্রী মীর আলী শের নুয়াই এবং পরে সুলতান হুসাইন বায়করার পৃষ্ঠপোষকতা পান। হিরাত একাডেমীর পরিচালক হিসেবে বিহ্যাদ তৈমুরি চিত্রশিল্পের পূর্ণতা আনেন। তৈমুরি চিত্রশালাকে উৎকর্ষ এবং মর্যাদার স্বর্ণশিখরে উপনীত

করেছিলো বিহ্যাদীয় শিল্পীরীতি।

সময় বিবেচনায় কবি জামি (র.)-এর সাথে শিল্পী বিহ্যাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দুজনেই রাজানুকূল্য পদমর্যাদা পেয়েছিলেন। শিল্পী বিহ্যাদ কবি জামি (র.)-এর এই প্রতিকৃতিটি সামনাসামনি কিংবা স্মৃতি থেকেও এঁকে থাকতে পারেন। এই লেখায় বিশ্বের ইতিহাসের আকাশচূম্বি দুই মুসলিম গৌরব ও প্রতিভা সময়ের দাবিতেই এক হলেন।

সহায়ক সূত্র: Jami-Wikipedia,  
<http://en.m.Wikipedia.org>

## সুফি উদ্ধৃতি

- যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে দুনিয়ার সকল বস্তুকে ভয় করে থাকে।
- যার ভিতর যে পরিমাণ খোদাতত্ত্ব জ্ঞান রয়েছে, সে খোদাকে সে পরিমাণ ভয় করে থাকে। আর আখেরাতের প্রতি যার যতটুকু অনুরাগ সে দুনিয়ায় সে পরিমাণই বর্জন করে থাকে।
- দুনিয়ার আসত্ত্বিমূলক কোন কাজ আরম্ভ করা খুবই সহজ, কিন্তু তা নির্বাহ করা এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন।
- মনে রেখ! যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য কোন সম্ভল অর্জন করল না তাকে দুনিয়ার কোন সম্পদ দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তুমি যা উপর্যুক্ত করছ আখেরাতেও তুমি তাই পাবে। এখন তোমার ই"ছা বেশীও উপার্যুক্ত করতে পার আবার কমও উপার্যুক্ত করতে পার।
- যে ব্যক্তি নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করে, সে বিনয়রূপ মহামূল্য নেয়ামত হতে বাধ্যত হয়।
- যে ব্যক্তি আল্লাহত্ত্বায়ালাকে চেনার মত চিনেছে, সে ব্যক্তি আল্লাহত্ত্বায়ালার ইবাদত যেমন করা উচিত তেমন করতে পারে। আর আল্লাহ ভিন্ন দুনিয়ার কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হওয়াই প্রকৃত বীরত্ব।

-হ্যরত আবু আলী ফুয়াইল ইবন আয়াফ (রহ.)

করেছিলেন এবং তাঁর দুই হাত অন্যান্য সব বন্দীদের মতোই বেঁধেছিলেন। যদিও তাঁর দুই হাত বাঁধার কাজটি আল্লাহর আদেশেই করা হয়েছিল, তথাপিও রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। আপনাদের কাছে এসব দুঃখকষ্ট ও বিষাদ এসে থাকে অপর কাউকে কষ্ট ও ক্রেশ দেয়ার পরিণতিতেই। আপনারা কী করেছিলেন তা বিস্তারিত মনে রাখতে না পারলেও ফলাফল হতে কর্ম সম্পর্কে জানতে পারেন। আপনাদের অবহেলা বা অজ্ঞতা থেকে তা ঘটেছিল কি না, বা অন্যরা আপনাদেরকে ভুল কাজ সংঘটনে পরিচালিত করেছিল কি না, তা হয়তো আপনারা মনে রাখতে না-ও পারেন। কিন্তু ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করুন: এতে আপনাদের কতোটুকু অধঃপতন হয়েছে, অথবা আপনাদের অন্তর কতোটা প্রশংসন হয়েছে? অধঃপতন অবশ্যই আল্লাহত্তালার প্রতি অবাধ্যতার প্রতিদানস্বরূপ, আর অন্তরের প্রশংসন তাঁরই আনুগত্যের এক পুরুষার। একবার মহানবী (স.)-কে হাতের আঙুলে আংটি পরার জন্যে (মণ্ড) অনুযোগ করে বলা হয়: “আমি আপনাকে অনর্থক ও খেলাধুলোর জন্যে সৃষ্টি করিনি।” এ থেকেই আপনারা নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন আপনাদের দিনগুলো কি আনুগত্য না অবাধ্যতায় কাটছে। পয়গম্বর মুসা (আ.) মানুষের বিষয়গুলোতে মনোনিবিষ্ট ছিলেন (সমাধানকল্পে)। যদিও তিনি খোদাতালার আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তাঁরই খেদমতে ছিলেন পুরোপুরিভাবে নিবেদিত, তবুও তাঁর একটি দিক মানবতার সার্বিক কল্যাণে ছিল মগ্ন। হ্যারত খিয়ির (আ.)-ও আল্লাহত্তালার খেদমতে ছিলেন পুরোপুরি মগ্ন; তিনি অন্যান্যদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (স.) প্রথমে আল্লাহত্তালার ধ্যানে ছিলেন নিবিষ্ট; অতঃপর তাঁকে বলা হয়, “মানুষকে (ঘীনের পথে) আহ্বান করুন। তাদেরকে উপদেশ দিন এবং পরিশুল্ক করুন।” রাসূলুল্লাহ (স.) কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করেন, “হে প্রভু, আমি কী দোষ করেছি? আপনি কেন আপনার সান্নিধ্য (বা আপনার সামনে উপস্থিত অবস্থা) থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন? এই জগতের প্রতি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা-ই নেই।” আল্লাহত্তালা তাঁকে বলেন, “হে রাসূল (স.)! আপনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন না, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করবো না। অন্যান্যদের মাঝেও আপনি আমার সান্নিধ্যেই থাকবেন। মানুষের জন্য (কল্যাণে) আপনি যখন মগ্ন থাকবেন, তখনো (নৈকট্যের) এই লগ্নের একটি মহূর্ত-ও আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে না। আপনি যে কাজেই জড়িত হন না কেন, আমার সাথে একাত্ত থাকবেন।” কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন: “খোদাতালা যে

পূর্ব-নির্ধারিত চিরস্তন বিধান জারি করেছেন, তা কি কখনো পরিবর্তিত হয়?”

মওলানা রূমী (রহ.) উত্তর দেন: আল্লাহ পাক কীভাবে আদেশ দিতে পারেন, “নেকি তথা পুণ্য খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাপ সংঘটন করো?” কেউ গম চাষ করে কি যবের ফসল (ঘরে) তুলতে পারে? অথবা যবের চাষ করে কি গম? এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সকল আম্বিয়া (আ.) ও আউলিয়া (রহ.)-ই বলেছেন যে, সমস্ত ভালাই উত্তম কর্মেরই পুরুষার, আর মন্দ পাপেরই পরিণতি। কেউ অণু পরিমাণ পুণ্য করলে তার সুফল পাবে, আবার অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তার পরিণতিও সে ভোগ করবে।

কেউ একজন মাঝখানে যোগ করেন: “কিন্তু আমরা যে বদমাশ লোকদেরকে পুণ্যবান হয়ে যেতে দেখি, আবার ভালো লোকদেরকেও বদমাশে পরিণত হতে দেখি।”

মওলানা রূমী (রহ.) উত্তর দেন: হ্যাঁ, ওই সব বদমাশ নারী-পুরুষ কিছু নেক কর্ম করেছে বটে, বা উত্তম কাজের চিন্তা করেছে, যা কিছু ভালাই তাদেরকে এনে দিয়েছে। আর ওই সব পুণ্যবান ব্যক্তি কিছু মন্দ কাজ করেছে, বা মন্দ চিন্তা করেছে, যা তাদেরকে বদমাশে পরিণত করেছে।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন: “মহানবী (স.)-এর প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক -এ কথার মানে কী?”

মওলানা রূমী (রহ.) উত্তর দেন: এর অর্থ আমাদের মহৱত্পূর্ণ সমস্ত কর্ম, সেবা ও ইবাদত-বন্দেগীর কোনো কিছুই আমাদের মালিকানাধীন নয়, বরং এগুলো আল্লাহত্তালা হতে আগত। ঠিক যেমনি বসন্তকাল বয়ে আনে বীজ বপন ও বন-জঙ্গলে প্রমোদবিহার। এগুলো বসন্তের উপহার ও দান। এই দুনিয়াবাসী অমুখ্য বা গৌণ কারণগুলো দেখে থাকে এবং মনে করে যে এগুলোই বুঝি সব কিছুর মূল। কিন্তু খোদাতালার আউলিয়া (রহ.)-বৃন্দ এগুলোর সৃষ্টি ও অস্তিত্বশীল হওয়ার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। অমুখ্য কারণগুলো হচ্ছে সাধারণ মানুষকে মনোনিবিষ্ট রাখার স্বেচ্ছা একটি পর্দা। আল্লাহত্তালা পয়গম্বর যাকারিয়া (আ.)-কে প্রতিশ্রূতি দেন এ কথা বলে, “আমি আপনাকে একজন পুত্র সন্তান দেবো।” হ্যারত যাকারিয়া (আ.) কেঁদে আরয় করেন, “আমি তো এক বৃন্দ ব্যক্তি, আর আমার স্ত্রীও এখন বৃন্দা। আমার কামভাব বর্তমানে দুর্বল; উপরন্তু, আমার স্ত্রীও গর্ভধারণের অতীত। হে প্রভু, কীভাবে পুত্র সন্তানের জন্ম হবে?” খোদায়ী উত্তর এলো, “যাকারিয়া, শুনুন! আপনি যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। আমি আপনাকে এক লক্ষবার দেখিয়েছি যে বাস্তবতার কোনো কারণ-ই নেই। (চলবে)

## পাঠক পর্যবেক্ষণ

# বাংলার সুন্নিয়াত আজ কোন পথে?

আমরা যারা সাধারণ শিক্ষিত বা মাদরাসায় পড়ার সুযোগ পাইনি, এককথায় আমরা যারা সরাসরি কুরআন-হাদিস পড়ে বুঝতে পারি না, তারা সমাজের আলেম সমাজকে খুবই শ্রদ্ধা-সম্মান-ভক্তি করি। তাঁদের উপর আমাদের একটি আস্থা আছে যে, তাঁরা আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। আমরা যা বুঝি না তা আমাদের বুঝিয়ে দিবেন।

রেজতীয়ার মুরিদ, কেউ আজমগড়ীয়ার মুরিদ অর্থাৎ সবাই কোন না কোন পীরের মুরিদ-ভক্ত-অনুসারী এবং ত্বরিকতপন্থী। কিন্তু এখানেও দেখা যায় ভিন্ন মত। বরং এটাকেই কেন্দ্র করে সুন্নিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মতানৈক্য ও দলাদলি। কেউ তাঁর নিজের পীরকে ছাড়া অন্য কোন পীরকে মানতেই রাজি না। আর দরবারি আলেমগণ সব সময়ে নিজ দরবারের সুনাম করতে গিয়ে অতিরঞ্চনে ব্যস্ত। আমরা ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটাই বুঝি যে ত্বরিকতপন্থী মানেই নিজের আমিত্তকে বিলীন করে দেয়া, কাউকে ঘৃণা-হিংসা-বিদ্বেষ-অবজ্ঞা-আক্রমণ না করা।

**আমরা ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটাই  
বুঝি যে ত্বরিকতপন্থী  
মানেই নিজের আমিত্তকে  
বিলীন করে দেয়া,  
কাউকে ঘৃণা-হিংসা-  
বিদ্বেষ-অবজ্ঞা-আক্রমণ  
না করা। কিন্তু বর্তমানে  
আমরা যে ত্বরিকত চর্চা  
দেখছি তা কোনু  
ত্বরিকত?**

অলিভিজ্য ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারিহিসেবে দেখতে পাব কি না তা নিয়ে আমরা সন্দিহান ও চিন্তিত। এই যুব সমাজের কাছেই আমাদের সুন্নি আলেম সমাজ আজ ব্যাপকভাবে অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত বলে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যাচ্ছে। তারা তাদের মনের একান্ত চিন্তা-ভাবনা-প্রশ্নের উভর ও সমাধান না পেয়ে অন্য দিকে ঝুঁকছে। এটা অস্বীকার করার মত কেউ আশা করি নেই। বিজ্ঞ-প্রাঞ্জ-অভিজ্ঞ সুন্নি আলেমগণের কাছে সাধারণ সুন্নি-জনতার বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন হলো- এই সমস্যার সমাধান কী? এই দলাদলির শেষ কোথায়? আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কী হবে? আমরা কি তাদের সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলতে পারব না? নিজেদের মধ্যে ১০% ফুরুয়ী (শাখা) মাসয়ালায় যে মতপার্থক্য তা কি সমাধা করা যায় না? আগামী ১০-১৫ বছর পর বাংলাদেশের সুন্নিদের অবস্থান কোথায় হবে চিন্তা করা উচিত নয় কি?

## অধস্তনদের সাথে দুর্ব্যবহার জান্মাতের পথে বাধা

### ● ফিরোজ আহমাদ ●

শ্রমিক-কর্মচারী হলো কল-কারখানার প্রাণ। শ্রমিক-কর্মচারী কল-কারখানার উৎপাদনের চাকাকে সচল করেন। গৃহপরিচারিকা গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। একজন উদ্যোক্তা বা মালিক কল-কারখানা কিংবা দোকান-পাটের পুঁজি সরবরাহ করেন। আর শ্রমিক-কর্মচারী তার কায়িক শ্রম, মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কল-কারখানার মালিকের পুঁজির বিকাশ ঘটান। অধীনস্থ শ্রমিকের সাথে ভালো ব্যবহার করা সুন্নত। অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হন। এছাড়া ভালো ব্যবহার করলে শ্রমিক-কর্মচারীর মন সদা-সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। কল-কারখানার দৈনন্দিন উৎপাদনের কাজে গতি আসে। শ্রমিকরা কাজের প্রতি অধিক মনোযোগি থাকেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, ঘনিষ্ঠ আতীয়, এতিম, মিসকিন, আতীয় প্রতিবেশী, অনাতীয় প্রতিবেশী, পথচারী-সঙ্গী ও তোমার অধিকারভুক্তদের সাথেও’-(সূরা নিসাঃ ৩৬)।

শ্রমিকের হাত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। মেহনত করে জীবিকা নির্বাহ করা নবী-রাসূলগণের সুন্নত। হ্যরত আদম (আ.) চাষাবাদ করেছেন। হ্যরত দাউদ (আ.) কর্মকারের কাজ করেছেন। হ্যরত নূহ (আ.) ছুতারের কাজ করেছেন। হ্যরত ইদ্রিছ (আ.) দর্জির কাজ করেছেন। হ্যরত মুছা (আ.) বকরি চড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। হ্যরত রাসূল (দ.) এর নিকট কোনো একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইতে আসলে, তিনি ভিক্ষুকের নিকট থাকা বাটি এবং কম্বল বাজারে বিক্রি করে, কুঠার কিনে বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করার জন্য তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

শ্রমিকদের সাথে কখনও অন্যায়ভাবে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। অপমান অপদস্থ করা যাবে না। কারণ জুলুম নির্যাতনকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় ব্যক্তি পরকালে নিশ্চিত জাহানামী। যে ব্যক্তি জুলুম করে তাকে ‘জালিম’ বলা হয় আর যার প্রতি যুলুম করা হয় তাকে ‘মাজলুম’ বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কারো প্রতি অন্যায় অবিচার কিংবা কারো হক নষ্ট করাকে ‘জুলুম’ বলে। সাধারণতঃ সমাজে ধনীরা গরীবের উপর, মালিকরা শ্রমিকের উপর, শক্তিশালীরা দুর্বলের উপর, পদস্থরা অধীনস্থদের উপর জুলুম করে থাকেন। অসহায়

এতিম দুর্বলের উপর অত্যাচারের কারণে আল্লাহ তায়ালা অতীতে বহু অত্যাচারী শাসক ও জাতি-গোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব অত্যাচারী শাসক ও ব্যক্তিবর্গ কিয়ামত পর্যন্ত ঘৃণিত হতে থাকবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুম করেছে’-(সূরা ইউনুস:১৩)। বিশ্বস্ত, সৎ ও ন্যায়বান অধস্তন শ্রমিক-কর্মচারীর বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, ‘তুমি মাজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা সে আল্লাহর দরবারে তাঁর হক লাভের জন্য প্রার্থনা করে।’ (মিশকাত : ৪৯০৭)। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, ‘তুমি মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা তার ফরিয়াদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকেন।’ (বুখারি: ২২৮৬)।

শ্রমিক-কর্মচারীদেরও বিশ্বস্ততার সাথে কল-কারখানায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। যে শ্রমিক অধিক বিশ্বস্ত, তিনি কল-কারখানার আদর্শ শ্রমিক। শ্রমিকদের বিশ্বস্ততার সাথে কল-কারখানায়, দোকান-পাটে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমার মজুর হিসেবে সে উত্তম (বলে প্রমাণিত) হবে, যে হবে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত’-(সূরা কাসাস:২৬)।

শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী তার গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি পরিশোধ করতে হবে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ: ২৪৪৩)। হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের অধস্তন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। সুতরাং আল্লাহ যে ভাইকে যেন তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। (বুখারি: ৮/৬০৫০)। হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (দ.) এর সর্বশেষ বাণী ছিলো, ১. সালাত এবং ২. যারা তোমাদের অধীন

তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আবু দাউদ: ৪/৫১৫৬)।

অধস্তন শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে দুর্ব্যবহার করলে কল-কারখানা ও বাসা-বাড়ির বরকত কমে যায়। মালিক-শ্রমিকের সাথে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিষয়টি মিমাংসা করে নিতে হবে। হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান আতার প্রতি তার মান-সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ের ব্যাপারে জুলুম করে তবে সে যেন তার নিকট হতে সেদিন আসার পূর্বে আজই মাফ করিয়ে নেয়, যেদিন তার নিকট দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন তার নিকট যদি কোন আমল থাকে, তবে তার জুলুম পরিমান নেকী নিয়ে নেয়া হবে। আর তার নিকট নেকীও না থাকলে মাজলুম ব্যক্তির গুনাহ সমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।’ (মিশকাত: ৪৮৯৯)।

হ্যরত উমর (রা.) মরুভূমিতে পথ চলার সময় ভ্রত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজেই উটের লাগাম ধরে হেঁটেছেন। মালিক-শ্রমিক পার্থক্য শুধু এতোটুকুই, যার পুঁজি আছে, তিনি মালিক। আর যার পুঁজি নেই, তিনি শ্রমিক। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রিজিকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন’-(সূরা নাহল: ৭১)। ‘আপনি দেখেন, কিভাবে আমি (পার্থিব সম্পদের বেলায়) তাদের একজনকে আরেক জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম’-(সূরা বনি ইসরাইল: ২১)। শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতি মালিকের সদাচরণ উদারতার বহিঃপ্রকাশ পায়। পারস্পরিক মমত্ববোধ সহনশীলতাই ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

অধস্তন শ্রমিক-কর্মচারী ও গৃহপরিচারিকার সাথে দুর্ব্যবহারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানিদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (জামে তিরিমিয়ি: ১৯৪৬)। হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত রাসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার বিতর্ক হবে। ১. ঐ ব্যক্তি যে, আমার নামে কোনো চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। ২. সেই ব্যক্তি যে, কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। ৩. সেই ব্যক্তি যে, মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি ভাবে করিয়ে নিয়েছে, অথচ

তার মজুরি দেয় নি। (বুখারি: ২২৭০)। শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে উভয় ব্যবহার করে আমাদের জান্নাতের পথ প্রশস্ত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

## সুফি উদ্ধৃতি

- যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না।
- নির্জনতা অবলম্বনেই শান্তি।
- অন্য চিন্তা মনে স্থান না পেলেই তওহীদের জ্ঞান লাভ হয়।
- মনকে আল্লাহর দরবারে হাজির রাখবে। তাহলে শয়তান সেখানে স্থান পাবে না।
- আমি উচ্চমর্যাদা তালাশ করেছিলাম, বিনয় দ্বারা তা লাভ করলাম। নেতৃত্ব তালাশ করেছিলাম, সত্যের মধ্যে তা পেয়েছি। গৌরব তালাশ করেছিলাম, দারিদ্র্যের মধ্যে তা পেয়েছি। আভিজাত্য তালাশ করেছি, পরহেয়গারীর মধ্যে তা লাভ করেছি। মহত্ত্ব চেয়েছি, অল্লে তুষ্ট থাকার মধ্যে তা লাভ করেছি। অপরের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার কামনা করেছিলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করে তা লাভ করেছি।

-হ্যরত ওয়াইস্কুরণী (রা.)

- যখন দেখবে তোমার মধ্যে কারো সঙ্গে শক্রতার ভাব ও বাগড়া-কলহের কোন স্পৃহা নাই, তখন বুঝবে যে, তোমার মারিফাত হাসিল হয়েছে।
- অনন্ত সুখের আলয় বেহেশ্ত সামান্য কয়েক দিনের আমল দ্বারা লাভ করা যায় না, তার জন্য কঠোর সাধনা এবং নেক নিয়তের প্রয়োজন।
- তোমার চিন্তা শক্তি তোমার জন্য একটি দর্পণস্বরূপ, তুমি তার সাহায্যে তোমার যাবতীয় নেক ও বদ কাজগুলো দেখতে পাবে।
- নির্জনতায় ও নিরবতায় যার মনে আল্লাহর মহিমা চিন্তা না হয়, তার সমস্ত নিরবতা ও নির্জনতা আল্লাহ তায়ালা হতে উদাসীনতা এবং কামরিপু প্রসূত।
- যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে সে তাঁর সাথে ভালবাসা-মহবত স্থাপন করেছে। আর যে দুনিয়াকে চিনেছে সে দুনিয়ার মোহে মত হয়েছে এবং খোদার সাথে শক্রতা গড়ে তুলেছে।

-হ্যরত ইমাম হাসান বসরী (রা.)

# ঈদুল আযহা'র মর্মবাণী উদ্বারের সময় এখন

## ॥ আলোকধারা প্রতিবেদন ॥

ঈদুল আযহা আসছে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও মুসলমান সমাজের ঘরে ঘরে এই উৎসব উদয়াপনের প্রস্তুতি চলছে। সেই সঙ্গে আবারো সবার সামনে আসছে এই ঈদ থেকে এবং এই ঈদের অন্তর্নিহিত বাণী থেকে আতঙ্গন্ধি ও যথার্থ মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ মুসলিম হয়ে উঠার শিক্ষার সুযোগ।

আজ আমরা ঈসায়ী সন হিসেবে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অতিক্রম করছি। কিন্তু সারাবিশ্বে একদিকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ কিংবা মুসলমানদের প্রভাবে গড়ে উঠা সার্বভৌম দেশ সমূহ নিয়ে পরিচিত মুসলিম বিশ্বে মুসলমানরা দুর্দশার শেষ সীমায় উপনীত। এরকম একটি পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। বিংশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে মুসলমান সমাজ, ভেতরে-বাইরে নানা দিক থেকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আঘাতে বিপন্ন। অনৈক্য, গৃহবিবাদ, মত ও পথের অসহিষ্ণুতা ইসলামের মূল মর্মবাণী ও বিশ্ব-মানবিক নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সর্বোপরি ধর্মের মূল ধারার স্পিরি�চুয়ালিটি বা আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি সমকালিন মুসলমানদের গভীরভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। এই বিপন্ন অবস্থায় তাসাওউফ ও নানা ত্বরিকার সুফিবাদ থেকে শান্তি, প্রেম ও মানবিক ঐক্যের মর্মবাণী দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের কাছে কে পৌঁছে দেবে? অবস্থা আজ এমনই অস্থির ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মুসলিম শিক্ষা, ইবাদত এবং মহান আল্লাহর ঐশি মহিমা উপলক্ষ্যের জন্য আধ্যাত্মিক ধ্যানেরও সুযোগ পাচ্ছেন না। দেশে দেশে বিপন্ন ও উদ্বাস্তু মুসলমানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অনেক মুসলমান আবার স্বদেশভূমি ছেড়ে ভিন্ন দেশে হয়েছেন শরণার্থী। কেউ বা আবার স্বজন-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গেছেন অন্য কোথাও। সেই সাথে অব্যাহত রয়েছে রক্ত ঝরানো নির্মম যুদ্ধ। কোথাও বা জ্বলে উঠে সংঘাতের অশনি সংকেত।

এরকম অস্থির পরিস্থিতিতে ঈদুল আযহা থেকে মুসলিম সমাজ যদি এবারেও এর অন্তর্নিহিত নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় মর্মবাণী খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তবে এটা হবে গভীর দুঃখের কারণ।

ঈদুল আযহার পটভূমি মহান আল্লাহর প্রতি প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার এক অতুলনীয় ঘটনা। যে ঘটনার সাথে হ্যরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.), বিবি হাজেরা এবং তাদের প্রিয়পুত্র হ্যরত ইসমাইল যবিহুল্লাহ (আ.) এর আল্লাহর প্রতি অকৃষ্ট ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

এক ঐতিহাসিক বর্ণনায় দেখা যায় এই ঘটনাটি আরবের মুক্তার কাছে ‘মিনা’ নামক স্থানে ৩৮০০ (সৌরবর্ষ) আগে সংঘটিত হয়েছিল। হ্যরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য প্রিয়পুত্র (জ্যেষ্ঠ) হ্যরত ইসমাইলকে (আ.) তাঁর পূর্ণসম্মতিতে কুরবানি করতে উদ্যত হন। পিতা ও পুত্রের অবিচল আনুগত্য ও নজিরবিহীন নিষ্ঠা দেখে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন। আল্লাহ তাঁর পুত্রের বদলে একটি পশ্চ কুরবানি করার আদেশ দেন। এই ঘটনাটিই আজো ‘মিনা’য় পৰিব্রত হজ্জে এবং মুসলিম জগতের সর্বত্র ১০ জিলহজ্জ তারিখ থেকে তিনদিন ঈদুল আযহা হিসেবে উদয়াপিত হয়।

প্রিয় বন্ধুকে ত্যাগ করা, বর্জন করা মানুষের জন্য বাস্তবিকই কঠিন পরীক্ষা। মানুষের শুন্দি সন্তার পাশাপাশি ভোগবাদী সন্তার আধিপত্য যে কী ব্যাপক- আমাদের বর্তমান বিশ্ব, আমাদের আশেপাশের সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ভোগবাদী সমাজে মানবিক মূল্যবোধ যেহেতু সম্মান পায় না, কাজেই সেখানে জাগতিক ক্ষমতা, অর্থবিত্ত, প্রতিপত্তি হয়ে উঠে মূল লক্ষ্যবস্তু। মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য সেখানে আধ্যাত্মিক সৌরভবিহীন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। ফলে মানুষের অন্তর হয়ে উঠে কঠিন, সহানুভূতিহীন ও সর্বভোগী। এসব কারণেই সমাজে দুন্দ-সংঘাত, হত্যা, হানা-হানি, অন্যের হক আত্মসাং, মিথ্যা-অনৈতিকতা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সময়ের যারা সত্যিকার সত্যপথগামি, তাঁরাই বলছেন সামাজিক এই লক্ষণ ও বিপর্যয়ের কথা। সাধারণ মানুষ আজ পরিস্থিতির শিকার। মানুষের মধ্যে অসততা ও স্বার্থপরতা আজ তুঙ্গে।

সৎ, ধার্মিক, নীতিবান ও শিক্ষিত মানুষকে ডাকা হচ্ছে ‘বোকা’। কপট ও অশিক্ষিত মানুষেরা সমাজের বিভিন্ন বৈত্ত ছিনতাই করে সমাজের উচ্চ আসনে আসিন হচ্ছে। ফলে

এসব চরিত্রের মানুষেরা কখনো কখনো নিজেরা নিজেরা সমবোতার মাধ্যমে সমাজকে ধ্বংস করছে। কখনো তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিচ্ছে। ধার্মিক ও সুফিবাদে বিশ্বাসী অধ্যাত্মজনেরা মনে করেন এই চরম পরিস্থিতিতে ঈদুল আযহা'র ভেতরে প্রস্তা ও সৃষ্টির মধ্যে ত্যাগ ও ভালবাসার যে চিরকালিন বার্তা রয়েছে তারই উন্মোচন প্রয়োজন। কারণ এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও বিশ্বাসের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ঐ সমাজই হতে পারে শান্তি ও সম্প্রীতির কাঞ্চিত সমাজ। অন্যথায় ঈদুল আযহা উৎসবকে কেন্দ্র করে পশু কুরবানির প্রতিযোগিতা মানুষের অন্তরে পরোক্ষভাবে প্রতিহিংসার বীজ বপন করবে। ত্যাগ ও বিশ্বাসের স্থলে অনাস্থা অনেকের জন্ম দেবে।

কাজেই ঈদুল আযহা পশু কুরবানি ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাই শুধু নয়। এটি বহন করে গভীর মানবিক বার্তা। এর মধ্যে যেগুলো ইতিবাচক কাজ সেগুলো হচ্ছে: কুরবানি করা পশুর গোশ্ত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা। যার আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তার পক্ষে পশু কুরবানি করা। আমাদের দেশে কুরবানির গোশ্ত তিন ভাগ করে ১ ভাগ নিজের খাওয়ার জন্য রাখা হয়। তবে এব্যাপারে অনেকে সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ না করে কুরবানির পুরো গোশ্তই সারা বছর নিজের খাওয়ার জন্য ফ্রীজে সংরক্ষণ করে রাখেন। এ বিষয়টি নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী কুরবানির গোশ্ত তিনভাগ করে বষ্টনই সামাজিক সাম্য-ন্যায় ও ভালবাসা বৃদ্ধিতে সহায়ক। তবে কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রির টাকা দান করে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। ফলে যথাযোগ্য স্থানে তা দান করার মধ্যেও থাকবে সামাজিক দায়িত্ববোধ।

এবার একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঈদুল আযহাকে দেখা যাক। হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) ও হ্যরত ইসমাইল (আ.) এর এই ঘটনাটি বিশ্বসাহিত্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে বলে সাহিত্য সমালোচকেরা মনে করেন। তাদের মতে শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য, স্পেন, তুরক্কের মতো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের সাহিত্যেই নয়, উপরন্তু ইয়োরোপের অনুসলিম সাহিত্যেও এর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রীসের মহাকবি হোমারকেও এই অসাধারণ আত্মত্যাগের ঘটনা প্রভাবান্বিত করে। বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়াড-এ বর্ণিত আউলিসে অবরুদ্ধ আগামেনন, দেবী ডায়ানাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজ কন্যা ইফিজেনিয়াকে (Iphigenia)

বলিদানের সিদ্ধান্ত নেন। শেষ মুহূর্তে দেবী ডায়ানা কর্তৃক ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে একটি মেষ স্থাপন করে সেটিকে উৎসর্গ করে ডায়ানার সন্তুষ্টি লাভ ইত্যাদি ঘটনা ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) এর ঘটনারই প্রভাবে রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন।

## সুফি উদ্ধৃতি

- নফসকে দুনিয়া হতে পর্দার আড়ালে রাখার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পর্দা হলো চোখের উপর পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া যেন নিষিদ্ধ বস্তসমূহের প্রতি দৃষ্টি করতে না পারে।
- যে উদর খাদ্যে পরিপূর্ণ তাতে আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।
- গুণাহ হতে বিরত না হয়ে শুধু মুখে আসতাগফিরুল্লাহ বলা অর্থাৎ মৌখিক তওবা করা মিথ্যাবাদীরই তওবা বটে।
- যে ব্যক্তি নিজের অতৎকরণকে পরহেজগারীর সাজে সজ্জিত করেছে সে ব্যক্তিই খোশহাল অর্থাৎ সে ব্যক্তির অবস্থাই উত্তম এবং নিরাপদ।
- অল্লাহর দেহ সুস্থ থাকে এবং গুণাহ যত কম করবে আত্মা ততই সুস্থ থাকবে।
- বিপদে পড়ে সবর বা ধৈর্য ধারণ আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং তদবস্থায় রায়ী এবং সন্তুষ্ট থাকাই আশ্চর্য বিষয়।
- মানুষ যে পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে, সে পর্যন্ত সৎপথে থাকবে। আর যখন আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে তখন মানুষ বিপথগামী হবে।
- দারিদ্র্য ও দরবেশীকে ভয় করাই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের ক্রোধ ও অসন্তোষের আলামত।
- পরহেজগারী দ্বারা যাদের অন্তর জীবিত এবং আল্লাহতাঁয়ালার যিকিরে যাদের অন্তর খুশী তাঁদের সংসর্গে থাকলে প্রকৃত জীবন লাভ করা যায়।
- যে ব্যক্তি নিজের চক্ষু ও কর্ণকে কু-প্রবৃত্তি হতে ফিরিয়ে রাখে, সেই আল্লাহ পাকের নেক্কার বান্দা। তোমার মনে যে পর্যন্ত মানুষের প্রতি মহৱত বিদ্যমান, সে পর্যন্ত তোমার মনে আল্লাহ পাকের মহৱত স্থান পাবে বলে মনে করো না।

-হ্যরত যুন্নুন মিসরী (রহ.)



**হাক্কুল ইবাদ:** SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন 'দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী সুবিধাবস্থিত কর্মক্ষম ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে আত্মকর্মসংস্থানমূলক সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচি:



১১ মে ২০১৯: সমাজসেবা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম (বাম থেকে তৃতীয়) নগদ অর্থ তুলে দিচ্ছেন।



৩০ মে ২০১৯: সিএমপি কার্যালয়ে নগর বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ (ডান থেকে তৃতীয়) নগদ অর্থ তুলে দিচ্ছেন।



৫ জুলাই ২০১৯: মাইজভাণ্ডার শরিফ 'হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খন্তনা সেন্টার'-এ ১২জন শারীরিক প্রতিবন্ধীর মাঝে হইল চেয়ার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি।



১২ এপ্রিল ২০১৯: রাঙ্গুনীয়া উপজেলার রাজানগর লালানগর ইউনিয়নস্থ ধামাইরহাটে 'সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ দাতব্য চিকিৎসালয়' উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি রাঙ্গুনীয়া দক্ষিণ রাজানগর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আহমদ হৈয়েদ তালুকদার।



১৯ জুন ২০১৯: ফটিকছড়ির আজিমপুর 'শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দাতব্য চিকিৎসালয়'-এ বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সেবা প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন, ফটিকছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হোসেন মোহাম্মদ আবু তৈয়েব।



## শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

### শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী  
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. উচ্চুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও  
হিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্সিটিউট (দাখিল),  
পশ্চিম গোমদঙ্গি ১৯এ ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
৪. গাউছিয়া কলন্দুরীয়া নঙ্গমীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা  
ও এতিমখানা, বেচছড়ি ১ম ওয়ার্ড, ১৩নং ইমলামপুর, ঠাঁশছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৫. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী  
(কং) স্কুল, শান্তিরদীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল  
হক মাইজভাণ্ডারী হিফ্যখানা ও এতিমখানা  
হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৭. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী  
(কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৮. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী  
মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,  
হাটপুরুরিয়া, বটতলী বাজার, বুড়া, কুমিল্লা।
১০. মাদ্রাসা শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
মনোহরদী, নরসিংদী।
১১. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব  
লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১২. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল  
হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক,  
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী  
পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী,  
বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৬. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল  
হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া  
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৯. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২০. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
এয়াকবুদ্দী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২১. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২২. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়া হাট,  
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৩. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া  
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৪. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং)  
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৫. বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ  
খাদেম বাড়ি (ত্রয় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট,  
উত্তর বিশিল, থানা- শাহ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

### শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

◆ শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল

### দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প:

- ◆ হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খন্তনা সেন্টার, মাইজভাণ্ডার শরিফ
- ◆ সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ দাতব্য চিকিৎসালয়, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম
- ◆ দাতব্য চিকিৎসালয়, সিলমিল বাজার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- ◆ দাতব্য চিকিৎসালয়, ইস্পাহানী সি-গেইট, আকবর শাহ, চট্টগ্রাম
- ◆ দাতব্য চিকিৎসালয়, ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
- ◆ শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দাতব্য চিকিৎসালয়, আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

### দরিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- ◆ যাকাত তহবিল
- ◆ দুষ্ট সাহায্য তহবিল

### মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
- ◆ আলোকধারা বুকস্
- ◆ মাসিক আলোকধারা

### আয়োগ্যনমূলক যুব সংগঠন : তাজকিয়া

### মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন:

- ◆ আলোর পথে
- ◆ দি মেসেজ

### সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
- ◆ মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন

### জনসেবা প্রকল্প:

- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদাতখানা, নাজিরহাট, তেমুহী রাস্তার মাঝে।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

### বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে:

- ◆ ন্যায়মূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ) ভার্মান ওয়ুখানা ও ট্যালেট